রবীন্দ্র ছোটগল্পে রূপায়িত দাম্পত্য জীবনচিত্র

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এম. ফিল ডিগ্রির জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

তত্ত্বাবধায়ক

আহমদ কবির
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

449598
Dhaka University Library
449598

গবেষক

নাহিদা আক্তার শিলা
যোগদানের তারিখ-১৪/১০/২০০৫
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ০২ শিক্ষাবর্ষ : ২০০২-২০০৩
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, ঢাকা, বাংলাদেশ ।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্র ছোটগল্পে রূপায়িত দাম্পত্য জীবনচিত্র

নাহিদা আক্তার শিলা

449598

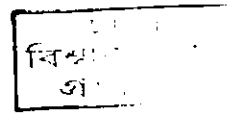

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

ডিসেম্বর ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৬

৯ ডিসেম্বর ২০০৯

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, নাহিদা আক্তার শিলা, আমার তত্ত্বাবধানে 'রবীন্দ্র ছোটগল্পে রূপায়িত দাম্পত্য জীবনচিত্র' শীর্ষক এম.ফিল গবেষণা- অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছে।এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে এর আগে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি অথবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোথাও ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। রচিত অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-শাখায় জমা দেওয়ার জন্য অনুমোদিত হল।

449598

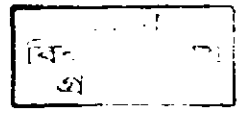

আহমদ কবির

আহমদ কবির

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, 'রবীন্দ্র ছোটগল্পে রূপায়িত দাম্পত্য জীবনচিত্র' অভিসন্দর্ভের কোনো অধ্যায় বা অংশ, পূর্ণ বা আংশিকভাবে, কোথাও মুদ্রিত, গ্রন্থিত বা প্রকাশিত হয়নি। তাছাড়া রচিত অভিসন্দর্ভের কোনো অধ্যায় বা অংশ, গবেষণা প্রস্তাবের বর্হিভূত নয়। এই অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত সব তথ্যনির্দেশের এবং উদ্ধৃতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ ও সর্তকতা অবলম্বন করা হয়েছে । এবং ব্যবহৃত তথ্য ও উদ্ধৃতিগুলোর উৎসানুসন্ধান করে ঋণ স্বীকার করা হয়েছে। এগুলো প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে 'তথ্যসূত্র' হিসেবে এবং উপসংহারের পরে 'গ্রন্থপঞ্জি' হিসেবে সংযোজিত হয়েছে।

গবেষক

নাহিদা আক্তার শিলা

যোগদানের তারিখ-১৪/১০/২০০৫

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ০২

শিক্ষাবর্ষ : ২০০২-২০০৩

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ছোটগল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তাঁর হাতেই বাংলা ছোটগল্পের বিষয় ও রূপরীতি তৈরী হয়েছে এবং তিনিই প্রথম বাংলা ছোটগল্পকে একটি সার্থক শিল্পিত রূপদান করেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলো *'গল্পগুচ্ছ'* নামে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৯০৮-১৯০৯)। *'গল্পগুচ্ছে'* অন্যূন একশ' গল্প রয়েছে। এসব গল্পে জীবনের বিচিত্র দিক ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রচুর গবেষণা থাকলেও দাম্পত্য জীবন নিয়ে উচ্চতর গবেষণা বেশি নেই।একথা বিবেচনা করে আমি আমার অভিসন্দর্ভের বিষয়টি নির্বাচন করেছি।

প্রস্তাবিত অভিসন্দর্ভের বিষয়ভুক্ত দাম্পত্যজীবন সংশ্লিষ্ট ছোটগল্পগুলোর মধ্যে দাম্পত্য জীবনের যে বহুমাত্রিক চিত্র অংকিত হয়েছে তার অনুসন্ধান করা হয়েছে। দাম্পত্য জীবনের সংকট, সমস্যা জীবনাকাঙ্ক্ষা, পারিবারিক অবস্থা ও অধিকারক্ষুণ্ন স্বাধীনতা, বর্হিবাস্তবতা ও অর্ন্তবাস্তবতার চিত্রও বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা হয়েছে।

'রবীন্দ্র ছোটগল্পে রূপায়িত দাম্পত্য জীবনচিত্র' শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভে ভূমিকা ব্যতিত চারটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায় : বাংলা ছোটগল্পের বিষয় হিসেবে দাম্পত্য সম্পর্ক এবং রবীন্দ্রনাথের গল্প প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্র ছোটগল্পে বিধৃত দাম্পত্য প্রেমচিত্র ও জীবনরূপ,তৃতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্র ছোটগল্পে রূপায়িত দাম্পত্য জীবন সংকট, চতুর্থ অধ্যায় : উপসংহার।

প্রথম অধ্যায়ে রবীন্দ্র পূর্ববর্তী গল্পকারদের লেখা দাম্পত্য জীবন সম্বলিত গল্পগুলোর পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের এমন সব গল্প,যেগুলোতে প্রেম ভালোবাসাপূর্ণ, মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক বিদ্যমান। সংসারে যেমন মায়া-মমতা প্রেম-প্রীতি আছে, তেমনি আছে সমস্যা ও সংকট। সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি নানা কারণে দাম্পত্য জীবন হয় বিপর্যস্ত আসে বিচ্ছিন্নতা। তৃতীয় অধ্যায়ে সেই সব সংকটপূর্ণ দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ উপসংহারে সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ উপস্থাপিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথের যে গল্পগুলোতে দাম্পত্য জীবনের চিত্র আছে, এবং যেসব দাম্পত্য জীবনের বিশেষ তাৎপর্য আছে কেবল সেই গল্পগুলোই এই অভিসন্দর্ভের আলোচনার বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি যাঁদের সহায়তা পেয়েছি,তাঁদের মধ্যে প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি-আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

কবিরকে। গবেষণার কাজে তিনি অনেক মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে, আমার গবেষণার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা, উপদেশ, নির্দেশ এই অভিসন্দর্ভ রচনার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে আমার এই গবেষণা কর্ম সংশোধনে সহায়তা করেছেন। অভিসন্দর্ভ রচনায় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ, এম.ফিল. প্রথম পর্বে যাঁর কোর্স করবার সুযোগ হয়েছিল, আমাকে সহযোগিতা করেছেন। গবেষণায় আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগের অধ্যাপক ফয়জুন্নেসা বেগম। অভিসন্দর্ভ রচনায় কালে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও গ্রন্থাদি দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শাহজাহান মিয়া, অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক নূরুর রহমান খান, তাঁদের সকলের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই অগ্রজপ্রতিম মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (পি,এইচ.ডি গবেষক) ও ড. মুহম্মদ সাইফুল ইসলামকে। তাঁদের কাছ থেকে আমি তথ্য ও পরামর্শ উভয়ই পেয়েছি। তাঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি আমার বাবা জমশেদ আলী এবং আমার মা ফিরোজা আক্তারকে। এঁদের দোয়া আমার পাথেয়। বড় বোন জায়িদা আক্তার শিখা, ছোট বোন নাফিসা আক্তার পিনা এবং ছোট ভাই উজায়ের আল মাহ্‌মুদ আদনান ও জাবের আল মাহ্‌মুদ আসলাম গবেষণা কাজে আমাকে সব সময় উৎসাহ দিয়েছে ও সাহায্য করেছে। বন্ধু ও সহপাঠী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রভাষক হোসনে আরা, মেহনাজ সাদ আফরোজ, মোঃ শাহীন আকন্দ ও খসরু আলম গবেষণা কাজে পরামর্শ দিয়েছে ও সহযোগিতা করেছে । তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। গবেষণা কাজে ব্যক্তিগত সংগ্রহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার,কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের নিজস্ব পাঠাগার (অধ্যাপক আবদুল হাই স্মৃতি পাঠকক্ষ) ব্যবহার করেছি। এই গবেষণা কাজে আরও অনেকের সহযোগিতা ও উৎসাহ পেয়েছি । আমাকে সহায়তাকারী সব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা , কর্মচারীবৃন্দ ও সুহৃদদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

নাহিদা আক্তার শিলা
এম.ফিল. গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা	১
ভূমিকা	২
প্রথম অধ্যায় : বাংলা ছোটগল্পের বিষয় হিসেবে দাম্পত্য সম্পর্ক এবং রবীন্দ্রনাথের গল্প প্রসঙ্গ	৯
দ্বিতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্র ছোটগল্পে বিধৃত দাম্পত্য প্রেমচিত্র ও জীবনরূপ	৪৫
তৃতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্র ছোটগল্পে রূপায়িত দাম্পত্য জীবনসংকট	৭৯
চতুর্থ অধ্যায় : উপসংহার	১১৮
গ্রন্থপঞ্জি	১২২

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ছোটগল্পের জনক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তাঁর হাতেই বাংলা ছোটগল্পের বিষয় ও রূপরীতি গড়ে উঠেছে এবং তিনিই প্রথম বাংলা ছোটগল্পকে সার্থক শিল্পিত রূপদান করেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলো '*গল্পগুচ্ছ*' নামে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৯০৮-১৯০৯)। '*গল্পগুচ্ছে*' অন্যূন একশ' গল্প রয়েছে। এসব গল্পে জীবনের বিচিত্র দিক ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রচুর গবেষণা থাকলেও দাম্পত্য জীবন নিয়ে উচ্চতর গবেষণা বেশি নেই। এইটি বিবেচনা করে আমি 'রবীন্দ্র ছোটগল্পে রূপায়িত দাম্পত্য জীবনচিত্র' শীর্ষক এম.ফিল. গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপন করছি।

নাহিদা আক্তার শিলা
এম.ফিল. গবেষক
বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

গল্প বলার ইতিহাস মানুষের ইতিহাসের সমান বলে দাবি করা যায়। তার কারণ মানুষ কথা বলার দিন থেকেই কোনো-না-কোনো রকম গল্প বলে আসছে। গুহাবাসী মানুষকে প্রতিনিয়ত নানা রকম হিংস জীবজন্তুর মোকাবেলা করতে হতো। ভয়ংকর সেসব জীবজন্তুকে প্রতিহত করার নানা কৌশল যেমন আয়ত্ত্ব করত তেমনি হয়ত সেই সব প্রাণীর সাথে সখ্যতা গড়ে তোলার মানসিকতা তারা পোষণ করত। তাদের এ মানসিকতা থেকে সম্ভবত উপকথার জন্ম । সেগুলোতে বন্য জীব-জন্তুর সাথে মানুষের সদভাব গড়ে তোলার চেষ্টা প্রতিফলিত হয়। মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে গিয়ে সৃষ্টি করল সমাজের। সমাজে নানা নিয়মকানুন, বিধি-নিষেধ, নৈতিকতাবোধ থেকে নীতি কথামূলক গল্পের সৃষ্টি। মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে আশ্রয় করে পল্লবিত হয় দেব-দেবীকেন্দ্রিক পৌরাণিক কাহিনী। ক্রমান্বয়ে গল্প হয়ে উঠে মানুষের বিনোদনের মাধ্যম। অবসর সময় মানুষ নানা রকমের গল্পগুজব করে আনন্দ লাভ করত এবং অন্যকেও আনন্দ দিত। বাড়ির বুড়ো-বুড়িরা চাঁদনী রাতে, শীতের সকালে বা বিকেলে রোদ পোহাতে পোহাতে তাদের নাতী-নাতনী, ছোট ছেলেমেয়েদের নানারকম মুখরোচক গল্প শোনাত। বাংলার জনপদে আজো টিকে আছে সেসব মজাদার শিশুতোষ গল্প-পান্তাবুড়ির গল্প, টোনাটুনির গল্প, বোকাকুমিরের গল্প, শুয়োরানী-দুয়োরানীর গল্প, রাজা বাদশার গল্প, ঘুমপাড়ানির গল্প, জীনপরী দৈত্য দানবের গল্প।

পরবর্তী সময়ে মানুষের নন্দনসাধনায় এসব গল্প যুক্ত হয়েছে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আমরা জানি যে, সাহিত্যকর্ম–মাত্রই মানবআত্মার নিজেকে প্রত্যক্ষ করবার স্বচ্ছ প্রতিফলক। এই বিবেচনায় গল্পসাহিত্য মানব জীবনের উজ্জ্বলতম দর্পণ। নিজের পুরো প্রতিরূপটিকে মানুষ মনের মতো করে গল্পের মধ্যেই পেয়ে থাকে। অর্থাৎ মানুষ তার নিজের রূপকে, নিজের চোখে দেখার অতৃপ্তিকে গল্পের মধ্য দিয়ে দেখার চেস্টা করে এবং গল্পের মাধ্যমেই তারা নিজেদের দেখা'র– নিজেকে জানা'র অমিশ্র বিশুদ্ধ আনন্দ সংগ্রহে প্রয়াসী হয়। এ–কারণে গল্প –সাহিত্যে –মানুষের সংলগ্নতা এতো বেশি।

> 'It is a form of literature which includes all the other forms: poetry, drama, history,biography, science, sociology, politics, adventure, religion and art' [১]

মানবমনে গল্পের আকর্ষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্ন অভিমত দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে। "জীবনের রূপ যত ব্যাপক ও সম্পূর্ণভাবে এতে বিম্বিত হতে পারে, আর কোনো সাহিত্যিক রূপায়ণে তা প্রায় অসম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের স্থূলতম কামনা থেকে অন্তর্গূঢ় বেদনা, দীপ্ত বীর্যগাথা থেকে করুণামথিত শোককথা, নির্জীব বর্ণনা থেকে নাটকীয়তাঘন সংঘাতচিত্র, গল্পসাহিত্যের আধারে সব কিছুই সমান দক্ষতার সঙ্গে গড়ে তোলা সম্ভব।"[২]

শুরুতে মানুষ মুখে মুখে গল্প বলেছে এবং বংশ পরম্পরায় সেই ধারা অব্যাহত থেকেছে। পরে লিখিত রূপ পেয়ে তা সংরক্ষিত হয়েছে। অসংখ্য প্রাচীন গল্প রয়েছে, যেগুলো হয়তো কালোত্তীর্ণ রসের অধিকারী হয়ে ওঠেনি। তবুও সমকালীন জীবনপ্রবাহের অভিব্যক্তি যে এগুলোতে একেবারেই নেই তা বলা যায় না। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম গল্পের ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে। এ যাবত যত গল্পের লিখিত পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি মিশরের গল্পকার 'আন্নানা'[৩]র, প্রায় ৩২০০ বছর আগের। এর চেয়েও প্রাচীন গল্প খাফরি'র* গল্প [৪]। আপাত দৃষ্টিতে তাঁর গল্পকে অদ্ভুত এবং অর্থহীন মনে হয় । কিন্তু বিশেষ বিচারে আদিম মিশরীয় পুরুষদের নারীর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার এবং যে –কোনো মন্ত্রবলে নারীর স্বৈরাচরণের প্রতিবিধানের অভিপ্রায় স্পষ্ট। আমরা জানি যে, প্রাচীন মিশরে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে নারীই ছিলো বিষয়ের একচ্ছ অধিকারিণী। বিয়ের পর পুরুষকে সমস্ত সম্পত্তি তার স্ত্রীর হাতে সমর্পণ করে দিতে হতো। অনুমান করা হয় যে, বর্বর যুগের অবসানে নারীই প্রথম কৃষিকলা আয়ত্ত করেছিল। এবং নারী শস্য-ফুল ফলের পসরা সাজিয়ে পুরুষকে প্রলুব্ধ করত। এমনকি বিবাহিতা নারী বিবাহবন্ধন ছিন্ন না করেও বহুচারিণী হতে পারত। ফলে একজন মিশরী স্বামীকে স্ত্রীর এরূপ ব্যভিচারকে বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হত সে যুগে । পুরুষের পক্ষে এ হেন অবস্থার অবসান হয়েছে পরবর্তী সময়ে মিশরে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। খাফ্‌রি তাঁর গল্পের মূলীভূত জীবন–বাসনাকে সমকালীনতার সীমা অতিক্রম করে বিশাল বিস্তৃত শিল্পের পরিমণ্ডলে পরিব্যপ্ত করতে না পারলেও এর মধ্যে সমকালীন জীবন মুক্তির মৌল প্রেরণা অপরিমেয়।

বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে গল্পের সেই আদি ধারায় রচিত হয়েছে চারটি শাশ্বত গল্পগ্রন্থ-ভারতবর্ষে লিখেছেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন *'মহাভারত'*, বাল্মীকি *'রামায়ণ'* এবং গ্রিসদেশে হোমার *'ইলিয়ড,ওডেসি*। ভারতীয় ঐতিহ্যের মূলে *'রামায়ণ' 'মহাভারত'*, এবং ইউরোপীয় ঐতিহ্যের মূলে *'ইলিয়ড'*,*'ওডেসি'*র মর্যাদা। ট্রয়যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত হয়েছে *'ইলিয়ড'*,*'ওডেসি'*। খ্রি.পূ ত্রয়োদশ শতকে গ্রিকদের সাথে ট্রোজানদের সংঘর্ষ হয়। এর পাঁচশত বছর পর খ্রি.পূ অষ্টম শতকে হোমার ট্রয়ের যুদ্ধের কাহিনীকে ইউরোপীয় ঐতিহ্যসংলগ্ন করে শিল্পসম্মত রূপ দেন। *'ইলিয়ড'*-এ যুদ্ধের কাহিনী এবং *ওডেসি'*তে যুদ্ধের পরবর্তী কাহিনী স্থান পেয়েছে। ট্রয়ের যুদ্ধশেষে যুদ্ধের নায়ক ওডিসাসের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে *ওডেসি'*তে। ইথাকার রাজা ওডিসাস পিতা লার্টেস, পত্নী পেনিলোপি, শিশুপুত্র টেলিমেকাস এবং

Dhaka University Institutional Repository

প্রজাদের রেখে যুদ্ধে যোগ দেন এবং দশ বছর যুদ্ধে কাটান। এ কাহিনী আছে '*ইলিয়ড*'-এ । যুদ্ধশেষে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেশে ফিরে আসতে আরো দশ বছর লাগে ওডিসাসের।

'*মহাভারত*', '*রামায়ণ*', '*ইলিয়ড*, *ওডেসি*তে ব্যাপকভাবে অসম্ভাব্যতা ও লৌকিকতা আছে। তবু এগুলোর মধ্য দিয়ে সমকালীন জীবনের যে ছবি পূর্ণাঙ্গ হয়ে নিত্যকালের দরবারে উপস্থিত হয়েছে তার গুরুত্ব অনেক। '*রামায়ণে*'*র* গল্প আজও আমাদের মনকে অভিভূত করে। যাগযজ্ঞ, তন্ত্র- মন্ত্রের বেশ ছড়াছড়ি আছে '*রামায়ণে*'। কিশোর বয়সে রামচন্দ্র কর্তৃক তাড়কা রাক্ষসীকে বধ; হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে বিয়ে; পরশুরামকে পরাভূত করে সীতাকে গৃহলক্ষ্মী করা ইত্যাদি নানা ঘটনার মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সব শেষে বানর নিয়ে রামের সাগরপারের দশাননকে জয় করতে যাওয়া। রাবণের এক কাঁধে দশটা মাথা কিভাবে আটকে থাকলো, সমুদ্রে পাথর-পাহাড় ভেসেছিল কোন্ মন্ত্রে, বানরেরা গাছ-পাথর-পর্বত নিয়ে কেমন যুদ্ধ করেছিল–এসব জিজ্ঞাসা একালে আমাদের কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে। কিন্তু তা হলেও গল্প- রসের শাশ্বত উৎকৃষ্টতা এতে নষ্ট হয় না। রামের সঙ্গী- সহকারীদের ছাপিয়ে তাঁর এ জীবনের অবিরাম অভিযান চিরন্তন মানুষের জীবনবিম্বকে পর্যায়ক্রমে প্রতিফলিত করে। আমরা দেখি যে, অল্প বয়সে রাজপুত্রকে প্রাসাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে , রাক্ষস-বধের উদ্দেশে যাত্রা করতে হয় সুদূরের পথে। এখানে রাক্ষস কী ধরণের জীব, তার বর্ণনা জরুরি হয়ে ওঠে না। কারণ *রামায়ণের* কবি এর পাঠককে গল্পের কাহিনীকে বিজ্ঞান- যুক্তি তর্কের মাধ্যমে বিশ্লেষণের অবকাশ দেন না। তাঁর মূল লক্ষ্য রামের বীরত্ব গাঁথার রসমন্থন। গল্পে রাক্ষসের হাতে রামের মৃত্যুও হতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। ফলে দুর্জয়কে জয় করবার অতন্দ্র সাধনার শক্তিতে সংগ্রামী মানুষের ইতিহাসে রামচন্দ্র একচ্ছত্রতা লাভ করেছেন; তাঁর জীবন–চেতনার মধ্যে নিত্যকালের মানুষ নিজ নিজ জীবন-দ্বন্দ্বের প্রতিবিম্বটিকে প্রত্যক্ষ করেছে।

"*রামায়ণে*"*র* মতো '*ওডিসি*',তেও আমরা আদিম মানুষের অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস, হিংসা- লালসা ইত্যাদি লক্ষ করি। এর কারণ মানবিক শক্তির ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সেকালের লোকের স্পষ্ট কোনো ধারণা অভাব। ফলে ঐসব গল্পের জীবনভূমিকে প্লাবিত করেছে অলৌকিক শক্তির অতি বিস্তার। তবু ওডিসাসের জীবনকেন্দ্রে সংগ্রামী মানুষের আশা ও ব্যর্থতা, বাসনা ও তিতিক্ষা, উৎসাহ ও অবসাদ সুতীব্র ভাবে প্রতিফলিত হয়ে গল্পরসকে অখণ্ড সঞ্জীবনী প্রেরণা দিয়েছে। তাছাড়া জীবনের সীমারেখা ও স্বভাবধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞানের অভাব ছিল বলেই আদিম মহাকাব্যের শিল্পি-সমাজকে অনেক অবান্তর ও অতিরিক্ত উপাদান সংগ্রহ করতে হয়েছে। এভাবে '*রামায়ণ*' '*মহাভারত*', '*ইলিয়ড*', '*ওডেসি*,'র একটি-দুটি উপাখ্যান নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে গড়ে উঠেছে জীবনের সংহত ও কেন্দ্রিত রূপের তির্যক দ্যুতি।

Dhaka University Institutional Repository

'রামায়ণের জীবন-রূপ এমনি করে ঘনীভূত হয়েছে কালিদাস ভবভূতির কাব্যনাটকে, *'ইলিয়ড,ওডেসি* - নবরূপ পেয়েছে গ্রিসের নাটকে, এবং ইতালির কাব্যে। এমনি করে মহাকাব্যে আকৃতি ক্রমশ ভেঙ্গে নতুন অঙ্গ পেয়েছে নাটকে, উপাখ্যান-কাব্যে; গদ্য–গল্পে, উপন্যাসে এবং সবশেষে ছোটগল্পে।

ছোটগল্পের উৎস সন্ধানে আরও এক ধরনের কাহিনী পাওয়া যায়। এই কাহিনীগুলোকে একত্রে 'আখ্যানক' বলা হয়ে থাকে। ঊনবিংশ শতকে বাংলাদেশে নানা ধরনের আখ্যান,উপাখ্যান, নীতিসন্দর্ভে ভরে উঠেছিল বঙ্গদেশ। এগুলো আরব্য উপন্যাস জাতীয় রোমাণ্টিক গল্প, মিশনারিদের দ্বারা সংকলিত নীতিগল্প, হিতোপদেশ- পঞ্চতন্ত্র জাতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে অনূদিত গল্প এবং অবাস্তব পটভূমিবর্জিত মৌলিক গল্প, মোটামুটি চারটি পর্যায়ে বিভক্ত। এগুলোতে কখনও দিগ্বিজয়ী রাজা-বাদশাহ, দীনহীন গরীব, সাধারণ মানুষ, পশুপাখির গল্প স্থান পেয়েছে। আবার কখনও বিক্রমাদিত্যের আশ্চর্য সিংহাসন ও বত্রিশটি শাপভ্রষ্ট নর্তকীর মূর্তিমতী হয়ে থাকার কাহিনী, বেতালের গল্পের ভয়ানক ভৌতিক পরিবেশ ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। অনেক সময়ের স্রোতে, অনেক সাধনায় এই গল্পগুলোর প্রবাহ চলেছে ভারতবর্ষের মানুষের মনোভূমিকে প্লাবিত করে। ফলে এ -ভূখণ্ডের অন্যসব দানের সঙ্গে বিশ্বসংস্কৃতিতে গল্পের দানটিও মর্যাদার।

বাংলায় ছাপা অক্ষরে গল্পের এ-প্রবাহ শুরু হয় *ফোর্ট* উইলিয়াম কলেজ থেকে উইলিয়াম কেরী কর্তৃক *'ইতিহাসমালা'* নামক গ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে ১৮১২ সালে । গোলকনাথ শর্মা কর্তৃক *'হিতোপদেশ'র* অনুবাদ, হরপ্রসাদ রায় কর্তৃক *'পুরুষ–পরীক্ষা'* অনুবাদ এ প্রবাহকে আরও গতিশীল করেছে। এর পর আরও বহু সংখ্যক সংস্কৃত নীতিকথা বিক্ষিপ্তভাবে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের *'বত্রিশ সিংহাসন'* ও *'প্রবোধচন্দ্রিকা'এবং* বিদ্যাসাগরের *'বেতালপঞ্চবিংশতি'* বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এগুলোর মধ্যেই বাঙালি প্রথম কাহিনী রসের স্বাদ অনুভব করেছিল।*'বত্রিশ সিংহাসনে'র* গল্পগুলির মধ্যে কেবল বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে বলে এর বৈচিত্র্য কম। কিন্তু'বেতালপঞ্চবিংশতি'র কাহিনীগুলিতে বিচিত্র রস যোজনের কারণে এটি অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। এখানে রাজন্যবর্গ থেকে শুরু করে দরিদ্র ব্রাহ্মণ, চোর, গৃহস্থ, বারবনিতা সব ধরনের চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। সংস্কৃতের পরবর্তী সময়ে 'পারস্যের গল্পে' এক নতুন ভাবালুতায় তন্ময় হয়েছিল বাঙালি। অনুবাদকের রসালো অনুবাদ এবং কালোপযোগী উপস্থাপনা ও প্রকাশ ভঙ্গিতে এ-গল্পগুলি বাঙালির মনে স্থান পেয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে আমরা আরব্য রজনীর গল্পের কথা বলতে পারি। এক একটা চমকপদ কাহিনী মৃত্যুর হাত থেকে এক একটা জীবনকে বাঁচিয়েছে। সুলতান শাহ্‌রিয়র তাঁর দুঃচরিত্রা স্ত্রীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে এক একজন তরুণীকে শুধু এক রাতের জন্য রানী করে পরদিন সকালে তাকে

Dhaka University Institutional Repository

হত্যা করতেন। এভাবে চলতে চলতে সুলতান একদিন কিভাবে শেষে একজন নারীর কাছে হার মানলেন সেই কাহিনীতে বাঙালি সহজেই আকৃষ্ট হয়েছে। সেই গল্পকথক বুদ্ধিমতী নারী গল্প বলে একরাতকে হাজার রাতের সীমায় বিস্তার করে দিল। এই একহাজার এক রাতের গল্পের মধ্যে খেয়ালি রাজা বাদশাহ, রাজকন্যা- রাজপুত্র, মায়াবী জিন, হারেমের নর্তকী, বসরাই গোলাপের গন্ধ ইত্যাদি বহু নিটোল আনন্দমুহূর্ত স্থান পেয়েছে। এসব গল্পের মনোমুগ্ধকর ভাষা,মায়া জাদু আর জিনের অসম্ভব শক্তির মধ্যে সেকালে মানুষের অনেক অন্ধবিশ্বাস, আচার-ধর্ম, পারস্পরিক সম্পর্ক, নারীর মূল্য-মর্যাদা ইত্যাদি মূর্ত হয়ে উঠেছে। পরবর্তী সময়ে এ-গল্প ধারায়–আলাদীনের আশ্চর্যচেরাগ, আলিবাবা চল্লিশ চোর, সিন্দাবাদ নাবিক, লায়লী-মজনু, শিরি–ফরহাদ, গোলেবকাওলি, চার দরবেশ ইত্যাদি কাহিনী বাঙালিকে আনন্দরসে ডুবিয়ে রেখেছে। ফারসি থেকে অনূদিত চণ্ডীচরণ মুন্সীর *'তোতা ইতিহাস'*-এর কথা গল্প প্রসঙ্গে আলোচনায় গুরুত্ব পাবার মতো বিষয়। খোজেস্তা সুন্দরী সদ্য-বিবাহিতা, তাঁর স্বামী প্রবাসী। এই সুযোগে সে অন্য পুরুষের আসক্ত হয়ে পড়ে। প্রতি রাতে সে যখন তাঁর প্রেমিকের কাছে যাবার আয়োজন করে তখন তাঁর স্বামী ময়মুনের পোষা তোতাপাখিটি তাকে একটি করে গল্প বলে রাত শেষ করে দেয়। এভাবে তোতা গল্প বলে বলে দিনের পর দিন খোজেস্তা সুন্দরীকে তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে মিলন থেকে মুক্ত রাখে। এবং এর মধ্যেই তাঁর স্বামী ময়মুন ফিরে আসে। 'তোতা ইতিহাস'-এর বেশির ভাগ গল্প জীবজন্তু নিয়ে হলেও তা মানুষের জীবনবিচ্ছিন্ন নয়।

১৮১৮ সালে *'দিগদর্শন'* পত্রিকায় নীতিমূলক গল্প ছাপা হতে থাকে। ইসপের গল্প, ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক কাহিনী এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কাহিনী এর সংলগ্ন হয়ে আসতে থাকে। ফলে ইংরেজি গল্পধারা, নীতি-ধর্ম, এবং অন্য নিরপেক্ষকাহিনী এই ত্রিমুখী পথ দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করেছিল। এ প্রসঙ্গে ১৮২৩ সালে প্রকাশিত *'সংবাদ কৌমুদী'*, ১৮৩০ সালে প্রকাশিত *'সংবাদ প্রভাকর'*, ১৮৫০ সালে প্রকাশিত *'বিবিধার্থ সংগ্রহ'* এবং ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত *'রহস্যসন্দর্ভ'* পত্রিকার ভূমিকা স্বীকার করতে হয়। খ্রিস্টান মিশনারিরা দ্বিভাষিক পত্রিকায় 'বালক*কালে শিক্ষার গুণ'*, *'দস্যুবৃত্তি'*, ইত্যাদি কিছু কিছু গল্পকাহিনী প্রকাশের মাধ্যমে তাঁদের ধর্ম-দর্শন প্রচারের চেষ্টা চালিয়েছে। এগুলোর পাশাপাশি *'সমাচার চন্দ্রিকা'* ,*সমাচার দর্পণে* (১৮৩২) প্রভৃতি পত্রিকায় অনেক নক্সা প্রকাশ হতে দেখা যায়;যেমন 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র মধ্যে এসকল নক্সা এবং উপভোগ্য অনেক সত্যকাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। আর এগুলোর ক্রমধারার আধুনিক ফসল আজকের ছোটগল্প, যা বঙ্কিমচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, ত্রৈলোকনাথ, প্রভাতকুমার, স্বর্ণকুমারী, পরশুরাম প্রমুখ হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে আশ্রয় নিয়েছে। আর রবীন্দ্রনাথ

Dhaka University Institutional Repository

তাকে নানা রূপ রস গন্ধে বিস্তারিত করেছেন আমাদের সবার মাঝে। গল্প এখন আর কেবল আনন্দ-উপভোগের নয়, জীবনকে বুঝবার এবং দেখবার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও। প্রসঙ্গটি রবীন্দ্রনাথের গল্পালোচনার আলোকে সমাজ মানুষের সুখ-দুঃখ, আবেগ-অনুভূতি, প্রেম-ভালবাসা, মিলন-বিরহ, দাম্পত্য-সংসার জীবন ইত্যাদি নানা টানাপোড়েনের বৃত্তান্ত এ গবেষণার ভিতরের অধ্যায়গুলোতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. H. Thomas and D. L. Thomas- "Living Biography of Famous Novelist. And authors' 'Introduction'

২. শ্রী ভূদেব চৌধুরী সম্পাদিত- বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার ,মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম প্রকাশ (নতুন সংস্করণ)২০০৩,কলকাতা-পৃষ্ঠা-৪

৩. International Library of Famous Literature' - Vol. - I.

৪. International Library of Famous Literature' - Vol. - I.

*"রাজা খুফুর বাবা ছিলেন নেবুকা। দলবল নিয়ে তিনি একদিন তাহ্–এর মন্দিরে যান। সেখানে রাজ লিপিকার ও যাদুকর শ্রেষ্ঠ 'উবাউয়ানের' তাঁর মন্দির পরিদর্শনে সাহায্য করছিলো। তখন যাদুকর-পত্নী দূর থেকে রাজ- পারিষদদের একজনের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। এবং পরিচারিকার মাধ্যমে উপহার সামগ্রী পাঠিয়ে পছন্দের পুরুষটিকে আহবান করেন। এর পর থেকে হ্রদের ওপরের নিভৃত জলগৃহে চলতে থাকে তাদের গোপন অভিসার। দিনভর নবীন-প্রিযার সম্ভোগ-সুখ শেষে প্রতি সন্ধ্যায় উষ্ণ শরীর শীতল করতে হ্রদের জলে স্নান করে ; রাতে আবার চলে সেই সুখের খেলা। যাদুকর, জলগৃহের রক্ষক কতৃক একদিন এই ঘটনা জেনে তিনি মোমের ছোট একটি পুতুল তৈরি করে তার কাছে দিয়ে দেন এবং সন্ধ্যায় ঐ রাজ- পারিষদের স্নানের সময হ্রদের জলে তা ছেড়ে দিতে বলেন। প্রভুর কথামত তিনি সেটাই করলেন। জলে পড়েই ঐ কুমির জীবন্ত হয়ে উঠে এবং ঐ পারিষদকে নিয়ে জলের তলায় ডুবে যায় । সাতদিন পর যাদুকর উবাউয়ানের- রাজাকে সেই হ্রদের তীরে ডেকে এনে ঐ কুমিরকে আহবান করেন, কুমির তার কথামত ঐ পারিষদকে নিয়ে জলের তল থেকে উঠে আসে। আর যাদুকরের হাতের স্পর্শে কুমিরটি আবার মোমের ছোট্ট কুমিরে পরিণত হয়। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে রাজার কাছে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার-এর নালিশ করেন ঐ পারিষদের বিরুদ্ধে। সব শুনে রাজা কুমিরকে আদেশ করেন,- 'তোমার জিনিস তুমি নিয়ে যাও'। অমনি মোমের কুমির জীবন্ত কুমির হয়ে ঐ পারিষদকে নিয়ে আবার জলের তলায় ডুবে যায়। এবং বিচার শেষে যাদুকর-পত্নীকে প্রাসাদের উত্তর পার্শ্বে দগ্ধ করা হয়।'

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পের বিষয় হিসেবে দাম্পত্য সম্পর্ক এবং রবীন্দ্রনাথের গল্প প্রসঙ্গ

বাংলা ছোটগল্পের পূর্ণতা ও বিকাশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান সর্বোচ্চ। তিনি ছোটগল্পের শ্রী বৃদ্ধি করে উন্নত ও মণ্ডিত করেছেন। তাঁর আগে ছোটগল্পের কিছু কিছু নমুনা আমরা পেয়েছি কিন্তু সেগুলো ছোটগল্পের আবেদনের দিক থেকে সামান্যই গুরুত্ব পেয়েছে। এর কারণ, ছোটগল্পের শুরুর দিকে যাঁরা গল্প লিখেছেন তাঁরা কোনো রকম নিরীক্ষা ছাড়া, অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই তা লিখেছেন। ফলে তাদের কৃতিত্বের দীনতা আছে কিন্তু চেষ্টায় প্রাণের অভাব নেই। তাই তাঁদের নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য আমাদের কাছে অসামান্য না হলেও ঐতিহাসিকতার দিক থেকে তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা কেবল ছোটগল্পের পথেরই সূচনা করেননি, সেই পথ মাধ্যমটিকেও উন্নত ও গতিশীল করবার যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছেন। কাজেই কেবল ঐতিহাসিক সত্যের কারণেই নয়' অন্য কারণেও আমরা তাঁদের কাছে ঋণী। এবং তা বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণযোগ্য বলে মনে করি। সেই পথের উৎসানুসন্ধানে দেখা যায় যে, "ছোট গল্পের জনক যদি রবীন্দ্রনাথ হন, বঙ্কিম অবশ্যই পিতামহ, জ্যেষ্ঠ্য ও খুল্লতাত যথাক্রমে পরশুরাম ও শরৎচন্দ্র। পিতৃকুল প্রাচীন সংস্কৃতের পঞ্চতন্ত্র, হিতোপাদেশ, জাতক কাহিনী ও দশ কুমার চরিতম। মাতৃকুল ইউরোপ ও আমেরিকার ছোট গল্প। এ জাতচক্রে লগ্নে ফ্রান্স ও রাশিয়ার প্রভাব, পঞ্চম বা বুদ্ধি গৃহকে প্রভাবান্বিত করেছে ইংল্যান্ড ও জার্মান, আর কর্মগৃহে বর্তমান আমেরিকার বিঘ্নহীন প্রতাপ।"[১]
বাংলা ছোটগল্পের বিষয় হিসেবে দাম্পত্য সম্পর্ক এবং রবীন্দ্রনাথের গল্প প্রসঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা প্রাথমিক পর্বের ছোটগল্প লেখকদের একটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করব। এতে বাংলা ছোটগল্পের প্রাথমিক অবস্থা থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত উত্তরণের একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

২.

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন অসামান্য ব্যক্তিত্ব। বহু ক্ষেত্রে আমরা তার কাছে ঋণী। বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁর ঋণ সামান্য এবং অসামান্য দুটোই। তিনি নিজে কোন ছোটগল্প লেখেননি; তার রচিত *ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধা-রানী, রজনী* প্রভৃতি গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত আকারের উপন্যাস-এ' অর্থে সামান্য। আর ছোটগল্পের বাহন, বঙ্গদর্শন পত্রিকার মাধ্যমে তিনি বাংলা ছোটগল্পের পথ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিলেন এ অর্থে অসামান্য। তাই

> "স্বাধীনতা আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন এক অপরিহার্য নাম ; তেমনি সাহিত্য সৃজন প্রক্রিয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর নামও অবিস্মরণীয়। তাঁর অমর লেখনী বঙ্গ দর্শনের

Dhaka University Institutional Repository

পাতায় ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, নাটক, সংগীত প্রভৃতি রচনার মধ্যদিয়ে এক নূতন সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার প্রবর্তণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করে নব্য শিক্ষিত বহু লেখকই সাহিত্য রচনায় আকৃষ্ট হন। গড়ে ওঠে বঙ্গদর্শন কেন্দ্রিক সাহিত্যিক গোষ্ঠী।"[২]

কোনো কোনো লেখক সমালোচক তাঁর *ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধা-রানী, রজনী* প্রভৃতিকে ছোটগল্পের ফ্রেমে ফেলে বিচার করতে চান; কিন্তু ছোটগল্পের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য বিচারে সে দাবী টেকে না । কেননা প্রথমত-ছোটগল্পের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল কাহিনীর এক মুখীনতা। শুরু হওয়ার পর থেকে কাহিনী নির্দিষ্ট গতি নিয়ে সোজা লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়। কাহিনীর শুরু থেকে সাধারণভাবে তার পরিণতির আবাসটি কাহিনীতে থাকে। সাধারণভাবে ছোটগল্পের কাহিনী উপকাহিনী বা শাখা কাহিনী বর্জিত হয়। কোথাও কোথাও উপক্রমণিকারূপে মূল কাহিনীর আগে মুখবন্ধও থাকে-যদিও তা মূল কাহিনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে অন্বিত থাকে। দ্বিতীয়ত-ছোটগল্পের শিল্পরূপের একটি অন্যতম মাত্রা নাটকীয়তা সৃষ্টি । কাহিনীর স্তরে স্তরে নাটকীয় সন্ধি গ্রন্থি ও আকস্মিকের প্রয়োগ নৈপূণ্য ছোটগল্পের সঙ্গতি ও পরিণতিকে বিশিষ্ট করে। তৃতীয়ত- ছোটগল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল জীবনের খণ্ডাংশের রূপায়ণ ও সেই রূপায়ণের মাধ্যমে বৃহৎ জীবনের আভাস দান। এই ত্রয়ী বিবেচনায় *ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধা-রানী, রজনী* প্রভৃতিকে ছোটগল্পের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না।এগুলোতে উপরোক্ত দ্বিতীয় গুণটি পাওয়া গেলেও তা জমে উঠেনি। কাজেই–আমাদের বিচারে *ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধা-রানী, রজনী* ছোটগল্প নয় বড় জোর বড়গল্প হতে পারে।

৩.

বঙ্কিম অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত "মধুমতী" গল্পটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প হিসেবে ধরা হয়। গল্পটি ১২৮০ বঙ্গাব্দে জৈষ্ঠ্য মাসে "বঙ্গদর্শন" দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'মধুমতী'। "বঙ্গদর্শন"-এ এটি উপন্যাস নামে পরিচিত করা হয়েছিল। কিন্তু মধুমতী'র কাহিনী বিন্যাস, গঠন শৈলী এবং ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য বিচারে 'মধুমতী' শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের মর্যাদা না পেয়ে, পেয়েছে ছোটগল্পের মর্যাদা। আকারের দিক থেকে গল্পটি বঙ্কিম চন্দ্রের "*ইন্দ্রিরা*" (প্রথম প্রকাশের সময় ১৮ পৃষ্ঠা) ও *যুগলাঙ্গুরীয়* (১৫ পৃষ্ঠা) রচনা দুটোর মতোই সংক্ষিপ্ত - চৌদ্দ পৃষ্ঠার কিছু বেশী। বিষয় পরিকল্পনা ও ভাষা ব্যবহারে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার প্রভাব আছে এতে। গল্পের কাহিনীতে সমকালীন জীবন-ভাবনা স্থান পেয়েছে। আমরা বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাসে সমকালের যে সামগ্রিক বিস্তার ও গভীরতা লক্ষ করি তার একটি খণ্ডচিত্র বলে মনে হয় "মধুমতী" গল্পের কাহিনীকে। 'এতে সমকালের বহুমুখী জীবন-জটিলতা থেকে একটি জীবনের একটি সমস্যা–এক আকস্মিক দুর্ঘটনার মধ্যদিয়ে উপস্থাপিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। ''বঙ্কিমচন্দ্রের *কপালকণ্ডলা'র* বহুল ছায়া সম্পাৎ সত্ত্বেও এই কারণেই 'মধুমতী' একটি ছোটগল্প, কেবল ছোট আকারের গল্পই নয়।''[৩]

'মধুমতী' গল্পের কাহিনীতে 'মধুমতী' হচ্ছে লাল গোপাল দত্তের 'স্ত্রী' আদরিণী'র নতুন নাম। । গল্পটিতে মধুমতীকে ঘিরে করালী প্রসন্নের প্রেম, সংসার জীবন এবং আদরিণীকে ঘিরে স্বামী লাল গোপাল দত্তের প্রেম,ভালোবাসা, দাম্পত্য জীবন সম্পর্কের চিত্রই মুখ্য হয়ে উঠেছে। ত্রিভুজ এই প্রেম ও দাম্পত্য সম্পর্কের সৃষ্টির মূলে ক্রীড়নকের ভূমিকায় রয়েছে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ-গ্রীষ্মকালীন ঝড়।

গল্পে আমরা দেখি যে, করালী প্রসন্ন ঢাকা থেকে কলকাতা যাবার পথে ঝড়ের কারণে মহম্মদপুর গ্রামের পার্শ্বে মধুমতীর তীরে শিবিকা নিয়ে অবস্থান করে। এবং নিরাশ মনে ঐ সময় পূর্ণিমার মধ্যরাত্রিতে নদী তীরে নৈশ্য প্রকৃতির নিস্তব্ধ শোভা দেখতে বেরিয়ে জলের কাছে প্রায় বাইশ বছর বয়স্কা এক অপরূপ সুষমাময়ী নারীর মৃতদেহ দেখতে পায় । এবং তার অনতি দূরে উপকূল ভূমিতে, দু' এক টুকরা ভাংগা কাঠ, নৌকার হাল দেখে সে বুঝতে পারে যে ঝড়ে নৌকা ডুবিতে মেয়েটি প্রাণ হারিয়েছে। তখন দক্ষ চিকিৎসক করালী নিজের পালকি থেকে গরম কাপড় ও প্রয়োজনীয় পানীয় ইত্যাদি এনে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের জন্য প্রাণান্ত চেষ্ঠা করে। এবং তাৎক্ষণিক কোনো পরিবর্তন না দেখে আস্তানায় ফিরে আসে । 'এমন সুন্দরীকে বাঁচানো গেলনা', চিকিৎসক জীবনের এমন দুঃখ অত বড় পরাভব আর কী হতে পারে'বলে ভেবে অস্থির হয় সে। তাঁর বার বার মনে পড়ে, নদী তীরে শয়ানা 'অপূর্ব-মহিময়ী' সেই মৃত রমণীর মুখমণ্ডল। এভাবে ভাবতে ভাবতে করালী ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখে যে সেই মেয়েটি উঠে এসে তার মুখোমুখি 'প্রেম পরিপুরিত 'লোচনে' মেয়েটি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তখন সে ঘুম থেকে উঠে অনেক খুঁজাখুজি করে, দেখলো লাশটি পালকির পার্শ্বে পড়ে আছে। পরীক্ষা করে দেখলো তাতে প্রাণ আছে। এবং তার চেষ্টাতেই মেয়েটির প্রাণ পেয়েছে এবং জ্ঞান হলে পালকির কাছে এসে আবার জ্ঞান হারিয়েছে। তারপর সে তাকে পালকিতে তুলে, নৌকা ভাড়া করে 'মধুমতী' পার হয়ে, নিয়ে চললো সৈয়দপুরে। বহু চেষ্ঠায় তার জ্ঞান ফিরলেও সে করালী প্রসন্নের কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে,ভরা যৌবনে কেবল চপলা বালিকার মতো অর্থহীন আচরণ করতে থাকলো। পরে করালী তাকে ' মধুমতী' নাম দিয়ে, তার দেখাশুনার জন্য একজন দাসী রেখে তার যত্ন নিলো, বিয়ে করলো এবং তাকে নিয়ে বাড়ী ফিরবার আয়োজন করলো। নৌকা করে বাড়ি ফিরার পথে সেই 'মধুমতী'র তীরে মহম্মদপুরের ঘাটে আসলে আবার ঝড় উঠে। সেই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে এক বিশালাকায় পুরুষমূর্তি নজরে আসে তাঁর। মাঝিরা তাকে জানালো যে ঝড়ের রাত্রিতে ঐ উদ্‌ভ্রান্ত লোকটিকে প্রায়ই এখানে দেখা যায়। করালীর বউ মধুমতীকে দেখে সবাই খুশী হলো। শুরু হলো করালী ও মধুমতীর দাম্পত্য জীবন। কোনো দ্বন্দ্ব নেই, সংকট নেই, সুখে -শান্তিতে ভরে উঠল তাদের জীবন। হঠাৎ একদিন করালী বৈষয়িক কাজে কলকাতায় গেলে ক্ষণিক বিরহে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মধুমতী। তখন করালীর বোন শ্যামাসুন্দরী, তাকে

Dhaka University Institutional Repository

একান্ত সখী-ভাবে প্রচণ্ড মমতায় শান্ত করতে চেষ্টা করে কিন্তু আর্তি কিছুতেই বাধা মানতে চায়না। শ্যামাসুন্দরী একসময়ে বিরক্ত হয়ে চলে যায় । তখন বিরহভরা সে- রাতের সমস্ত সুরকে উপেক্ষা করে মধুমতীর কানে ভেসে আসে বহু দিনের বহু পরিচিত বহু প্রিয় সুর। 'আদর তরঙ্গ বহে রূপের সাগরে'। 'মধুমতী' হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করে ফেলে, স্মৃতি ফিরে পায়। অসহ্য যন্ত্রণায় সে রাত পার করে। তাঁর মনে পড়ে- সে লাল গোপাল দত্তের স্ত্রী- তার অবিচল প্রেমের বরনারী। গোপাল ভালোবাসার এক তারার তারে স্ত্রী আদরিণীর বন্দনা সুর লাগিয়েছিল। স্বামীর কণ্ঠে প্রেমের সে সুর অপূর্ব মনে হতো তাঁর। তাই তাঁর বারবার তা শুনতে ইচ্ছে করত। পরদিন গোপনে করালীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করে স্ত্রীর সঙ্গে একান্ত নিভৃতে সাক্ষাৎ করে, এবং আদরিণীর কাছ থেকে নৌকা নিমজ্জন করালীর কাছে জীবন ও আশ্রয় লাভ সব দূর্ঘটনা শোনে গোপাল। কিন্তু করালীর সঙ্গে মধুমতী'র নতুন পরিণয় বন্ধনের ঘটনাটি আড়ালে থেকে যায়। গোপাল পরদিনই তাকে নিয়ে যেতে চাইলে করালী ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে মধুমতী। তখন থেকেই নদী তীরে চলতে থাকে তাদের দেখা সাক্ষাত। তারপর করালী ফিরে এসে তার প্রেম-বিহ্বলা সুন্দরী নববধূ- মধুমতীকে আগের মত পায় ফিরে পায় না আর । তাই সমস্ত প্রাসাদ নিদ্রাচ্ছন্ন হলেও সে জেগে থাকে। মধুমতী ও করালীর সুখের দাম্পত্য জীবনে হঠাৎ নেমে আসে অসুখের ছায়া । আস্তে আস্তে নিভে আসে দু'জনের মনের আলোও, যা থাকে তা দিয়ে যেনো একজন আরেকজনকে খুঁজে পায় না। তারপর একদিন ধর্মভীরু করালী সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ভাবে সধবা মধুমতী তার বৈধপত্নী হবার নয়। কাজেই তাকে ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে, সংসারের সুখ দিয়ে যাকে গড়ে তোলা তাকে ত্যাগ করা অপেক্ষা নিজের প্রাণত্যাগও সহজ। অন্যদিকে পূর্বারাত্রির কথা মত গোপাল আদরিণীর জন্য নদীর তীরে এসে কাউকে দেখে না। হঠাৎ তার চোখে পড়ে আদরিণী আবক্ষ জলে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর পূর্ব স্বামীকে সে কাছে ডেকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। তাঁর স্বামী গোপাল সব শুনে বলে– ভাগ্যে যা ছিলো হয়েছে, 'শত বিবাহ করলেও আদর তাঁর কাছে 'অত্যাজ্য' ইত্যাদি বলে স্ত্রীকে নিয়ে দেশান্তরী হয়ে সমস্ত কলঙ্ক আড়াল করে 'সুখে দিন যাপন' করবার পরিকল্পনা করে। কিন্তু আদরিণী –'আমি পরের। আমার প্রাণ পর্যন্ত পরের। আমি মহাপাপিষ্ঠা, আমি তোমার স্নেহ ভুলিয়া গিয়াছি। আমার সকল ভালবাসা নতুন স্বামীর প্রতি। আমি তোমার গৃহে যাইব না।' বলতে বলতে গভীর জলে নেমে যায়। গোপাল তাকে আকুল কণ্ঠে ফিরে আসতে বলে। কিন্তু সে ফিরেনা, অধরে হাসি এনে সে বলে- "আমি ফিরিবনা। কিন্তু তোমার কাছে এক ভিক্ষা, একবার আমাকে আলিঙ্গন কর-বুঝিব যে আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়াছ।"[৪]

তখন গভীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে লাল গোপাল দত্ত। তার স্ত্রী আদরিনীকে যদি ফিরে না পায়, তাহলে তার সঙ্গে যাওয়াই উত্তম মনে করে।"গোপাল চিবুক পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া চির প্রেমভাগিনী আদরিণীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিল।"তারপর উভয়কে পৃথিবীতে আর কেহ কখনও দেখিলনা।"[৫]

Dhaka University Institutional Repository

চিবুক জলে জীবন মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত হাস্যে মধুমতী 'যখন তার পূর্ব স্বামী লাল গোপালের 'আলিঙ্গন প্রত্যাশা করে, তখন তার মন থেকে করালী প্রসন্ন'র ছবি মুছে গিয়েছে বলেই মনে হয়। কাজেই একটি নদী পাড়ে একটি মৃতদেহকে কেন্দ্র করে গল্পের শুরু এবং একটি আত্মহত্যার মধ্যদিয়ে গল্পের শেষ-মাঝখানে যে উপকাহিনী তা মূল কাহিনীকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। গল্পটিতে ব্রাহ্মদের সধবা বিবাহ অপরাধ এবং পূর্ব স্বামী রেখে পুন বিবাহ কঠিন পাপ কর্ম হিসেবে উপস্থাপন, তৎকালের সামাজিক চিত্র এবং ধর্মীয় অনুশাসন।"যা গল্পের সংকট সৃষ্টি করেছে। তবে আত্মিক ধর্ম যাই হোক না কেন গঠন সৌকর্যের দিক থেকে মধুমতীকে ছোটগল্পের স্থলাভিসিক্ত করা চলে।" [৬]

৪.

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরে আমরা অগ্রণীর দিক থেকে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯) নাম করতে পারি । বেশ ক'টি ছোটগল্প লিখেছেন তিনি। তাঁর লেখার ধরন বিবেচনায় তিনি একজন অন্যমনস্ক লেখক । তাঁর দুটি রচনা 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' (১৮৭৭) এবং 'দামিনী' (১৮৯৩) এ দুটোকে ছোটগল্পের পূর্বাভাস বলে মনে করা হয়। এগুলোতে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য কিংবা উপন্যাসের জীবন সচেতনতা যথার্থ পরিমাণে নেই। "তাহার ঐশ্বর্য ছিল, গৃহিনীপনা ছিলনা।" [৭]

তার লেখায় লেখার পূর্ব পরিকল্পনা পাওয়া যায় না। ভাবনাহীনভাবে ভাবের প্রকাশ বলে মনে হয়। লিখতে লিখতেই যেনো তা রচনার রূপ নিয়েছে এবং তা শেষ হবার পরও রচনার গুনের অভাব দূর হয়নি। অর্থাৎ সেই রচনার জরিপ কাজে তার মনেযোগের বড় অভাব বোধ হয়। আমরা তাঁর 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' গল্পের আলোচনার সূত্র ধরে তাঁর সাহিত্যিক মানদণ্ড এবং এতে নারী পুরুষের সম্পর্ক ও দাম্পত্য জীবনবোধ কতখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে , সেই বিষয়ে আলোকপাত করবার চেষ্টা করবো।

'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' গল্পটি চারটি বিভাগে বিন্যস্ত। এতে ঘটনার বিবরণের বিস্তার আছে। কিন্তু গল্প বিষয়ের পরিধি রামেশ্বরের অদৃষ্ট'র উত্থান পতনকে ঘিরেই আবর্তিত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংবৃতও।

গল্পের কাহিনীতে আমরা দেখি যে, পিতৃশ্রাদ্ধ করতে পাঁচজনের পরামর্শ সর্বস্বান্ত হয় রামেশ্বর। তখন একে একে সবাই তাকে ছেড়ে চলে যায়। স্ত্রী পার্বতী, শিশু সন্তান আনন্দ গোপালের এবং নিজের ক্ষুধার তাড়নায় সে মাত্র আটখান পয়সা চুরি করে। বাকী টাকা হাতে পেয়েও সে রেখে আসে। পরে পৈতৃক ভিটে বাড়ী বিক্রি করে অপরিচিত এক গ্রামে চলে আসে, স্বাধীন ভাবে স্বামী-স্ত্রী মিলে কায়িক পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে । কিন্তু ঘটনা চক্রে তা আর হয়ে ওঠেনা । বিকল্প এক প্রস্তাব আসে,

Dhaka University Institutional Repository

জমিদারের মর্যাদা রক্ষার্থে অপরের চুরির দায় নিজের উপর চাপিয়ে জেল খাটার। রাজী হলে বিনিময়ে নগদ অর্থ এবং জেল শেষে চাকরির প্রতিশ্রুতি পায় সে। এভাবে রামেশ্বরের অদৃষ্টে অশুভ সব ঘটনার সমাবেশ ঘটতে শুরু করে।

তাঁর সতী সাধ্বী স্ত্রী ভুল করে তাকে অবিশ্বাস করে। চুরির পরিবর্তে খুনের দায় নিজের মাথায় তুলে নেয় সে। ফলে তার শাস্তি হয় বিশবছর দ্বীপান্তরবাস। ক্রমে সেই শাস্তি তাঁর কাছে চরম অসহ্যকর, অসস্তিকর হয়ে উঠে; স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার ভাবনা এবং পুত্রস্নেহকে কেন্দ্র কেরে নির্বাসন থেকে ছাড়া পেয়ে সে পাগলের মতো ছুটে আসে সন্তানের খোঁজে। তখন আরেকবার মার খায় অদৃষ্টের হাতে। আরো কিছু নতুন বিভ্রান্তি তাকে অতিষ্ট করে তোলে। ফলে অদম্য আক্রোশ তাকে সত্যি সত্যিই অশোভন কাজে ,অন্ধকার পথের দিকে নিয়ে যায়। দুর্ধর্ষ খুনী ডাকাত হয়ে ওঠে সে। কিন্তু অন্তরে সেএক তিলও মরে না। সেখানে আসল প্রাণ' প্রাণের মতোই থাকে। বাইরের সমস্ত অত্যাচারেও তাঁর অন্তরে বঞ্চিত প্রেমিক, বিড়ম্বিত পিতার বুকের চিতা নেবেনা, জ্বালা জুড়ায় না। এমনিভাবে চলতে চলতে এক নাটকীয় পরিবেশে স্ত্রী পুত্রের মধ্যে সে ফিরে আসে এবং নিজেকে অন্য এক রামেশ্বর হিসেবে উপলব্ধি করে। গল্পে পিতৃশ্রাদ্ধে অধিক ব্যয় করে সর্বস্বান্তের মধ্য দিয়ে যে সংকটটি সৃষ্টি হয়েছে সেইটিই পরবর্তীতে রামেশ্বরের পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আমরা দেখেছি যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বহু গল্প উপন্যাসে 'অর্থের অভাব' নানা অসংগতি ও অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে– নর-নারীর দাম্পত্য জীবনে। মূলত মানুষের ভাগ্য নিয়ে টানা-পোড়েনের রস প্রবল গল্প, রামেশ্বরের অদৃষ্ট। সেকালের দরিদ্র, ধর্মভীরু সরল মানুষের অর্থ ও সমাজগত চরম অসহায়তার মর্মান্তিক দিকটি এতে স্পষ্ট ।

"রামেশ্বরের অদৃষ্ট- ছোটগল্প-ই এমন দাবী করবার উপায় নেই। কিন্তু ছোট গল্প সম্ভাবনায় অবশ্যই আভাসিত । এখানেই বাংলা ছোটগল্পকলার প্রস্তুতি পর্বে সঞ্জীব চন্দ্রেরও স্মরণীয় ভূমিকা।"[৮]

৫.

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর ১২৯০ বঙ্গাব্দের পরে রবীন্দ্র সমসাময়িক যুগে অনেকেই আত্ম প্রকাশ করেছেন নতুন নতুন গল্প নিয়ে । এদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীতে বেশ বড় মাপের গল্পকার হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এবং সাহিত্য রসিক গল্প প্রেমিকদের কাছে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন। এদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২) প্রমথনাথ চৌধুরী, সুবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,সরলা দেবী, সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি, প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সেসময়ে ছোটগল্প লেখকের সারিতে ছিলেন হিরম্ময়ী দেবী, হরি সাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষিত, ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নারায়নচন্দ্র সেন, নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, জলধরসেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এদের মধ্য থেকে প্রথম দিককার ক'জনের গল্পালোচনা করে বাংলা ছোটগল্পের বিষয় হিসেবে দাম্পত্য সম্পর্ক 'র দিকটি তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।

৬.

ত্রৈলোকনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) হাস্য ও উদ্ভট অঙ্গীরসে বৈঠকী রীতির গল্পকার। শ্রোতা ও বক্তা মুখোমুখি গল্প বলার ঐতিহ্যবাহী মৌখিক রীতিটি তাঁর হাতে লিখিত রূপ পেয়েছে। এই ক্ষেত্রে বাংলাসাহিত্যে বিশেষ মৌলিকত্বের দাবীদার তিনি । যথার্থ ছোট গাল্পিকের প্রতিভা ছিল ত্রৈলোকনাথের, তাঁর গল্পে উৎসানুসন্ধ্যানে *জাতক, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বেতাল পঞ্চবিংশতি, আরব্য উপন্যাসের 'এক সহস্র এক রজনী'র* গল্পের বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়।

"ত্রৈলোক্যনাথের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তিনি তাঁর বাচনের আশ্চর্য কৌশলে উনবিংশ- বিংশ শতাব্দীর আধুনিক মনস্ক শিক্ষিত পাঠককেও মধ্যযুগীয় নিরক্ষর শ্রোতা করে তুলতে পেরেছিলেন।"[৯] ফলে তার গল্পের অবিশ্বাসও বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। জীবনের অন্তহীন সমস্যা জটিলতা অন্তরে অবধারণ করেও আদি -অন্তের জ্যামিতিক হিসাবকে সহজে অতিক্রম করার মানস প্রস্তুতি ছিল তার মধ্যে। একজন সার্থক ছোটগাল্পিকের যে আবশ্যিক গুণ, তা তার যথেষ্ঠ পরিমাণেই ছিল। জীবন সম্বন্ধে মমতা নিষ্ঠাবান হয়েও সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ। ফলে সমস্যাবহুল জটিল জীবনের পুরো বিশ্লেষণ করেও,যে কোনো কিছুকে আশ্রয় করেই তিনি তার একটি সম্পূর্ণ চিত্র এঁকে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। যেখানে থেকে খুশি গল্প শুরু করেছেন, সেখান থেকেই তিনি গল্পের যথার্থ কাহিনীকে গতিশীল করতে পেরেছেন।

বাংলা ছোটগল্প রচনার সূচনাপর্বে বা প্রাথমিক পর্যায়ে ত্রৈলোকনাথ আসর জমিয়েছিলেন । এবং গল্পে কৌতুক স্নিগ্ধতা, গল্পরস প্রবাহ সৃষ্টি করে তাঁর আসনটিকে বিশিষ্টতা দান করেছিলেন । তাঁর বহু ভঙ্গিল নির্মাণ বৈচিত্রমণ্ডিত উপকরণ উপাদানে সেই আদি পর্বটি বেশ মজবুত হয়ে উঠেছিল। ফলে বাংলা সাহিত্যে গল্প সৃজনার সুন্দর ও অধিকতর সহজ একটি পথ পেয়েছিল। তিনি আপন প্রতিভা বলেই তা করেছিলেন।

গল্প কাহিনীতে উদ্ভট বিষয়ের প্রয়োগ নৈপূণ্য ত্রৈলোক্যনাথের গল্প, স্বাদ, উপভোগ্য ও রসময় হয়ে উঠে। চঞ্চল্যার গাইগরুর আখ্যান জুড়ে রয়েছে তার প্রমাণ। তিনি হাসি তামাশার মাধ্যমে সমাজের নানা অসংগতিকে তুলে ধরবার চেষ্ঠা করেছেন তার গল্পে। সেই সূত্রেই নারী পুরুষের মানসিক অন্তদ্বন্দ্ব, দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং সামাজিক বিধি নিষেধের রক্তচক্ষু ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনা সূত্রে অল্প

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা অতিকথনে, অতি কিংবা অল্প যতনে আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে আমরা পূর্বোক্ত গল্পের ডমরু চরিত্রের কথা বলতে পারি, সে স্ত্রীকে রীতিমত ভয় করে চলে।

'চঞ্চলার জন্য একখানি নয় হাতি কাপড় কিনিয়াছিলাম। মনে করিলাম, বিছানায় আর বৃথা পড়িয়া থাকিব না। কাপড় খানি তাহাকে দিয়া আসি। এলোকেশির ভয়ে কাপড়খানি এক স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া ছিলাম।' "আমি জাগরিত হইয়াছি, দেখিয়া এলোকেশী বলিলেন কাল রাত্রিতে বিড় বিড় করিয়া ওরূপ বকিতেছিলে কেন? চঞ্চলা কে?"[১০]

গল্পে ঘুমের মধ্যে উদ্ভট ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে গিয়েও ডমরু একস্থানে এলোকেশে ঠাকুরানীর উগ্রমূর্তি তাঁর সামনে ভেসে উঠে। "ইনি আমার স্বামী । তোমরা ছাড়িয়া দাও। ইহাকে আমি বাড়ী লইয়া যাইব। বাড়ী গিয়া ঝাঁটা-পেটা করিয়া ইহাঁর ভূত ছাড়াইবো।"[১১] এখানে একদিকে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসা, অন্য দিকে পর নারী বা স্ত্রী ভিন্ন অন্য নারীর প্রতি আসক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে, যা চিরন্তন নারী ধর্মের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি। গল্পে ধর্ম বিশ্বাসের কথা এসেছে এবং পূজায় কিঞ্চিৎ ত্রুটি'র ফল হিসেবে শাস্তি পাওয়া সঙ্গত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথের ছোটগল্পের রচনাশৈলী তাঁর হাতে রূপ পেয়েছে নিতান্ত স্বভাব বশে, শিল্পী মনের একান্ত অবচেতনায়। ফলে তাঁর প্রায় সব লেখাতেই কাহিনীর বাস্তব রস অনুপস্থিত। যার কারণে স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক, প্রেম, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, প্রতিবেশের বাস্তব চিত্র তাঁর গল্পে খুব কমই স্থান পেয়েছে। "ত্রৈলোক্যনাথের সব কয়টি গল্পই আসলে শিল্পীর স্বেচ্ছা রচিত 'কথার গল্প'।

ত্রৈলোক্যনাথ গল্পের মাধ্যমে জাতির মঙ্গল চিন্তায় আত্মনিয়োগ করতে চাইলেও তা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেনি। গল্পগুলোতে সেই ধরনের কিছু কিছু চিন্তা থাকলেও তাতে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির কোনো চিন্তা নেই। অতীত নির্ভর রূপকথা বেশী, যা ঘুমন্ত জাতিকে আরো গভীর ঘুমে নিয়ে যায়। সাময়িক হাসির একটা ঢেউ হয়তো তিনি তুলেছেন পাঠকচিত্তে কিন্তু চিরকালের মুক্তির যে আনন্দ স্রোত, তা বহাতে পারেননি কোথাও। তবু তিনি আমাদের"বাংলা সাহিত্যের জাত শিল্পী। তাঁর প্রতিভা নিয়ে বাঙালির মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই।"[১২]

৭.

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৩২) রবীন্দ্রনাথের উত্তর সাধক। রবীন্দ্র সমসাময়িক সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছোটগল্পকার। রবীন্দ্র গোষ্ঠীর হয়েও তিনি রবীন্দ্র গোত্রের নন। আগাগোড়াই রবীন্দনাথের থেকে পৃথক। প্রথম বয়সে কবিতা দিয়ে সাহিত্য জগতে পা ফেললেও পরবর্তীতে প্রবন্ধের সঙ্গে বহু সংখ্যক গল্প উপন্যাসই ছিল তাঁর সৃষ্টির প্রধান বাহন। মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের উপদেশ ও উৎসাহকে পাথেয় করেই তিনি বাংলা গদ্য রচনায় অবতীর্ণ হন। তিনি নিজে বলেছেন -'রবিবাবুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই আমি

Dhaka University Institutional Repository

গদ্য রচনায় হাত দিই।' ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রসংবর্ধনাই তাঁর উৎসাহ ও সাহস যোগিয়েছিল । কারণ তার আগে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় শ্রী রাধামনি দেবী ছদ্মনামে গল্প প্রকাশ করেছিলেন । 'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশিত সেই গল্পগুলির প্রশংসা করেছিলেন 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ। তাতেই উৎসাহিত হয়ে প্রভাতকুমার স্বনামে গল্প প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন এবং বাংলা ছোটগল্পের আসনে আপন স্বাতন্ত্রে ভাস্বর হয়ে উঠেন।

স্বতঃস্ফুর্ততা, পরিমিতি বোধ, গ্রন্থন-নৈপুণ্য, এই তিনটি তাঁর গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য । হাস্যরস তার গল্পের প্রধান সঞ্চারী রস। কিন্তু রসিকতাই তাঁর গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। কারণ গল্প লেখক হিসেবে প্রভাতকুমার যেখানে সর্বাপেক্ষা রসোত্তীর্ণ, সেখানে তিনি রীতিমত 'সিরিয়াস'। দেবী, আদরিণী, হিমানী, কাশিবাসিনী, মাত্রাহীন, ইত্যাদি গল্প তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অভিজ্ঞতার বাইরে সাহিত্য রচনা করেননি 'পথ চলতে দু' হাতের মুঠোভরে জীবনের যতটুকু পেয়েছেন, কথার মধ্যে তাকে ঠিক তেমনি দিয়েছেন ধরে। ফলে তার অপেক্ষাকৃত অসফল উপন্যাস সাহিত্যে গুচ্ছায়িত স্কেচ এর সমষ্টি।' অপর পক্ষে তাঁর ছোটগল্পগুলি চলতি জীবনের এক এক টুকরো ভাসমান ছবি। একে লঘু বা অগভীর বলবনা -এর মধ্যে রয়েছে নুতন প্রকৃতির স্বাদ রবীন্দ্র সৃষ্টির স্বাদুতা থেকে যা ভিন্ন' তিনি সেই সমস্ত পাঠকদের চাহিদা পূরণে লিখেছেন, যাঁরা ভাল-মন্দ , কুসংস্কার আর রীতিনীতিতে আচ্ছন্ন, দৈনন্দিন সমাজ জীবনের নানা অসংগতি প্রত্যক্ষ করতে আগ্রহী। সেকারণে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাব সম্পদ এর মত করে গল্প লিখেন না। 'যদিও রবীন্দ্রনাথের মতো জীবনের ব্যাপ্তি, নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যানুভূতি, বিশ্বব্যাপী আনন্দ ও বিস্মৃতি প্রভাতকুমারের মধ্যে ছিলনা। কালগত দিক থেকে প্রভাতকুমার যেমন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যবর্তী তেমনি জীবনবোধের দিক থেকেও তিনি উভয়ের মধ্যবর্তী স্তরের।'[১৩] এই কারণেই তাঁর ছোটগল্পে জীবনের এত জটিলতা, গভীরতার দেখা মেলে না। কিন্তু জীবনের খণ্ড অংশের নিপুণ স্কেচ অংকনে তিনি অতুলনীয় শিল্পী। যদিও আমরা তাঁর গল্পে, রবীন্দ্রনাথের মত এতো কাব্যময় অনুভূতি, প্রচণ্ড আলোক রশ্মির মতো তীব্র ও মর্মভেদী অন্তদৃষ্টি, মানবচিত্তের অসীম রহস্যের মধ্যে বহিঃপ্রকৃতির এত বিচিত্র আবাহন ইত্যাদি উচ্চতর গুণের কিছুই পাইনা, তবু তাঁর ছোটগল্পের মধ্যদিয়ে আমরা এক নতুন রূপকথার রাজ্যে মুক্তি পাই। সেই রূপকথার রাজ্য বড়দের।

প্রভাতকুমার একটি সামান্য বিষয়কে ঘটনার সংস্থান নৈপূণ্যে, কাহিনী বর্ণনায় উপভোগ্যতায়, চরম পরিণতি বা ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টির দক্ষতায় সার্থক আকর্ষণীয় ছোটগল্পে পরিণত করতে পারতেন। ভাব গভীর মনস্তত্বমূলক সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁর সীমাবদ্ধাতার কথা উপলব্ধি করেই হয়তো তিনি জীবনের লঘু চপল দিকটিকেই ছোটগল্পের বিষয় হিসেবে আশ্রয় করেছিলেন। ফলে শরৎ পূর্ব তাঁর জনপ্রিয়তায় কেউ শরিক হতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাত কুমার অনেক উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলোকে মূলত- ছোটগল্পের আখ্যান বস্তুর বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ নিরীক্ষাহীন উপস্থাপন বলে মনে হয়েছে আমাদের। উপন্যাসের গঠন,কৌশলে তাঁর যত অযোগ্যতা আছে, ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তার বিন্দুমাত্র নেই। বরং ছোটগল্পের আঙ্গিকে পরিমিতি বোধ, ভূমিকাবর্জিত আরম্ভ এবং অতর্কিত- তৃপ্তিকর পরিণাম, অল্প কথায় সার্থক ঘটনা বিন্যাস, অন্ত নির্হিত রসবস্তুকে পূর্ণভাবে প্রকটিত করবার কৌশল ইত্যাদিতে তাঁর একটি সহজ অথচ নিপুণ অধিকার জন্মেছিল। একারণে তাঁর গল্পে শিল্পবোধ বা অসংলগ্নতার দোষ খুব একটা খুঁজে পাই না আমরা। তাঁর লঘু উপস্থাপনার মধ্যেও একটা গভীর সুর, প্রেমের মধ্যেও একটা স্নিগ্ধ কৌতুকবোধ– মার্জিত প্রকাশ আছে। এ-শক্তি তিনি পেয়ে থাকবেন তাঁর উচ্চ শিক্ষা এবং বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক পরিচয় থেকে।

রূপদক্ষ শিল্পী, পরিদৃশ্যমান জগত- জীবনের উন্মেষ সাধনে একক নিবিষ্ট চিত্ত গল্পে লিরিক প্রবনতা ও আঙ্গিকে মপাসাঁর'সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায় তাঁর। কেবল এই দিক-বিবেচনা করেই হয়ত প্রমথ চৌধুরী তাঁকে বাংলা গল্প সাহিত্যের –'গাই দ্য মঁপাসান্ট 'বলে অভিহিত করেছেন। নইলে মোপাসাঁর রচনা ভঙ্গীর তীব্র, তীক্ষ্ণ, তির্যকতা এবং অসংকোচ প্রকাশের দুর্নিবার সাহস তাঁর নেই। প্রভাতকুমারের গল্প সংকলনগুলো হলো-নবকথা (১৮৯১), *ষোড়শী* (১৯০৬), *দেশী ও বিলাতী* (১৯০৯, *গল্পাঞ্জলি* (১৯১৩), *গল্পবীথি* (১৯১৬), *পত্রপুষ্প* (১৯১৭), *গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প* (১৯২১), হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প (১৯২৩/২৪), বিলাসিনী (১৯২৬), যুবকের প্রেম (১৯২৮), নূতন বউ (১৯২৯), *জামাতা বাবাজী* । তাঁর মোট ১১৮ টি ছোটগল্পের বিশ্লেষণে দেখা যায় –প্রেম, বাৎসল্য , ধর্মীয় গোড়ামী ও অন্ধ সংস্কার, সমকালীন সমাজ সমস্যা এবং স্বাদেশীকতা বোধ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি গল্প লিখেছেন। বাংলা সাহিতে ছোটগল্প ও কথা সাহিত্যের সীমা বিস্তারে তাঁর একটা গুরুত্বপূণ ভূমিকা আছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের মত পূর্ববঙ্গ ও মধ্যবঙ্গের সীমায় গল্পের পট নির্মাণ করেননি, এর বাইরেও তাঁর গল্প প্রসারিত করেছেন। 'ফুলের মূল্য' গল্পটি এর সার্থক উদাহরণ। আবার' ভিখারী সাহেব' গল্পটি বিদেশী পাগল সাহেবের বাঙালি পোশাক, বঙ্গসংস্কৃতির প্রতি টান একই সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মেলবন্ধনে স্বতন্ত্র রূপ লাভ করেছে। বাংলা ছোটগল্পের ভাব বিস্তারেও নতুনত্ব এনেছেন তিনি। পশুর প্রতি মানুষের অপত্য প্রেম ও ভালবাসা প্রভাতকুমারের আগে বাংলা ছোটগল্পে এতো প্রাণবন্ত হয়ে আসেনি। বন্য জন্তু হাতি, সেও জয়রাম মোক্তারের গৃহে এসে তার পরিবারের একজন হয়ে যায়। সুদিনের একাত্মতা দূর্দিনেও ছিন্ন হতে চায়না- তার প্রাণস্পর্শী আলেখ্য আছে 'আদরিণী ' গল্পে। আর্থিক অবস্থার দৈন্যদশায়, আদরিণীকে বিক্রির জন্য বাধ্য হন জয়রাম মুখুজ্যে। বাঙালি সংসারে কন্যাদায় ও বিবাহ যে বেদনার বার্তা আনে, আদরিণীর বিক্রি হতে যাওয়ার সঙ্গে তা একাত্ম হয়ে গেছে। জয়রাম মুখুজ্যে আর্তনাদ করে বলেছেন- 'অভিমান করে চলে গেলি মা।' এর অল্প কিছু দিনের মধ্যে তিনিও

Dhaka University Institutional Repository

মারা যান। এখানে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, পশু ও মানুষের সম্পর্ক নিছক পাশবিক নয়, অত্যন্ত মানবিকও। তাই পারস্পরিক বিচ্ছেদে উভয়েই চিরপ্রস্থানের পথে পাড়ি জমিয়েছে। এই পরিচিত ঘটনাটিই প্রভাতকুমার ভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ করেছেন যা বাস্তবিক পক্ষে জীবনে একটা অচেনা, অজানা স্নিগ্ধতায় ভরে ওঠে পাঠক চিত্ত।

কুপ্রথা, কুসংস্কার , ধর্মীয় উন্মাদনা যে নারীর জীবনকে কতটা ট্র্যাজিক করে তুলতে পারে সেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে তাঁর 'দেবী' গল্পটিতে। এখানে সামাজিক গোঁড়ামি ও অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার গর্ভে মানবিকতার দিকটি, জীবনের অপরিচিত সত্যকে মূর্ত করেছেন তিনি। প্লটটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া হলেও, সৃষ্টি অকৃত্রিমহয়ে উঠেছে তাঁর হাতে। গল্পে কাহিনী সংক্ষেপ এরকম : উমাপ্রসাদের বাবা কালীকিঙ্কর ও তাঁর বৌমা (উমার স্ত্রী) দয়াময়ীকে জগন্ময়ী রূপে স্বপ্নে দেখেন। তার পর থেকে দয়াময়ীর জীবনে চলে আসে আমূল পবিরর্তন। বদলে যায় শশ্বরের স্বপ্নাদর্শন জাত ধর্মীয় সংস্কারের বলে। ফলে সংকট দেখা দেয় উমাপ্রসাদ ও দয়াময়ীর দাম্পত্য জীবনে। গ্রামের সমস্ত লোক আদ্যাশক্তির রূপ দয়াময়ীর পূজায় মেতে উঠে। কিন্তু উমাপ্রসাদের স্ত্রী দয়াময়ী নিজের দেবীত্বকে অস্বীকার করে স্বামীর সাথে পালিয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু পারেনা, মুমূর্ষু শিশুকে বাঁচিয়ে সে সত্যই দেবী হয়ে উঠে। এবং তাঁর স্বামী উমাপ্রসাদকে সে বলে-"হয়ত আমি তোমার স্ত্রী নই, হয়ত আমি দেবী। তা বলা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত নিজের ভাসুর পুত্র খোকাকে বাঁচাতে পারেনি দয়ামায়ী। এই ব্যর্থতা তাকে বিস্মিত ও মর্মাহত করে। তাঁর দেবীত্বের খোলস খুলে পড়ে। সকলে তাকে যা ভেবে পূজা করে তা থেকে তাদের মুক্তি দিতে কিংবা দেবীর মিথ্যা মোহ থেকে মুক্তি পেতে দয়াময়ী আত্মহত্যা করে। খোকার মৃত্যুর 'পরদিন কালীকিঙ্কর উঠিয়া পূজার ঘরে গিয়া দেখিলেন, সর্বনাশ! পরিধেয় বস্ত্র রজ্জুর মত করিয়া পাকাইয়া কড়ি কাঠে লাগাইয়া দেবী আত্মহত্যা করিয়াছেন। এখানে দয়ার পরিবর্তে 'দেবী' শব্দটি প্রয়োগ ব্যঞ্জনাময়,'দেবী' আত্মহত্যা করিয়াছেন, লক্ষনীয়। প্রভাতকুমারের এ গল্পটির সাথে বেশ খানিকটা মিল আছে, রবীন্দ্রনাথের জীবিত ও মৃত গল্পের সঙ্গে। সেখানে গল্পান্তে কাদম্বিনী মরে প্রমাণ করে সে মরেনি আর এখানে দয়াময়ী আত্মহত্যা করে প্রমাণ করে যে, সে আসলে দেবী নয়, রক্তমাংশের মানুষ, উমা প্রসাদের স্ত্রী। তবে জীবিত ও মৃত'র মতো এতো শক্তিশালী ছোটগল্প এটি নয়। প্রভাতকুমার,তাঁর গল্পে সমসাময়িক সমাজের নানা অসংগতি ও সংকটকে তুলে ধরেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের মননধর্মীতা,গভীর জীবন দার্শনিকতা এবং শরৎচন্দ্রে বঞ্চিত লাঞ্চিতের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি, নিরবিচ্ছিন্ন সৃষ্টির মাঝে দাঁড়িয়ে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে নতুন আলোক রশ্মি ফেলেছিলেন। তাঁর 'প্রত্যাবর্তন' গল্পে চিত্রিত হিন্দুধর্মের পুণরুত্থানের যুগের ধর্মীয় অনুসরণ, ইতিহাস সমাজ সম্মত। তিনি স্বদেশের সব জিনিস গ্রহণ এবং বিদেশের সব জিনিস বর্জনের পক্ষে ছিলেন না। "প্রতিজ্ঞাপুরণ" গল্পে পাশ্চাত্য শিক্ষার থেকে টোল শিক্ষার প্রতি বেশি আকৃষ্ট, ভবতোষের কালো মেয়েকে বিয়ে করার ঘটনা

Dhaka University Institutional Repository

কতখানি কৌতুককর হতে পারে সেই দিকটি তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পে জাতিধর্ম বর্ণের পার্থক্যের সংকট, সমস্যা আছে। 'খোকার কাণ্ড' গল্পে তিনি হিন্দু ধর্মত্যাগী রমণীর মধ্যে হিন্দু আচার দিকটি দেখিয়েছেন।

প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের চিত্রায়ন প্রভাতকুমারের ছোটগল্পের বেশীর ভাগ স্থান দখল করে আছে। প্রেমের মধ্যে বৈচিত্র আছে ভ্রাতৃপ্রেম, বন্ধুপ্রেম, সমাজ বিগর্হিত প্রেম ইত্যাদি। 'দাম্পত্য'প্রেমের গল্পগুলিতে নারীর সনাতন পাতিব্রত এবং একনিষ্ঠতার দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। এক সঙ্গে দুই স্ত্রী থাকলে পাতিব্রতের একনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। তাই বিলাতের ধোপাবাড়ীর চিঠি মিথ্যা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সুপ্রভা প্রকাশ চন্দ্রকে ঠিক গ্রহণ করতে পারেনি। (গল্পঃ বিলাত ফেরত বিপদ), হরিপ্রিয়া দেবী নির্মম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করলো স্বামী অপেক্ষা গুরুদেব বড় নয়, পূজা অর্চনাও বড় নয়। (গল্পঃ ভুল ভাঙ্গা) বিধবার প্রেমের ক্ষেত্রে প্রভাত কুমারের নির্মমতা ছিলোনা। কেননা (কলকাতায়) শিক্ষিত বিধবা বনলতা শ্বশুর গৃহ থেকে পালিয়ে কলকাতায় এসে, জ্ঞাতি নরেন্দ্রনাথকে বিয়ে করেছে। যিনি ছিলেন একজন উদার মতাবলম্বী সুশিক্ষিত মানুষ।

আমরা দেখি যে, তাঁর গল্পে- আপাত কঠিন জীবনের মধ্যে, কৌতুকের কর্মকাণ্ডের মধ্যে মানবজীবনের আর্তনাদ গুমরে উঠেছে। রসময়ীর রসিকতা এই ধারার সৃষ্টি। গল্পটি হাস্যরসাত্মক, কিন্তু প্রহসনমূলক নয়। এর আত্মায় জীবনের একটি সুগভীর সত্য নিহিত। রসময়ীর আচার আচরণে নিম্নজাতীয় রঙ্গরসের আধিক্য জীবন সত্য তৌলদণ্ডে পরীক্ষিত। এ গল্পের বড় সংকট রসময়ী ও ক্ষেত্র মোহনের দাম্পত্য সংকট, যা রসময়ীর সন্তান না হওয়াকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট। গল্পের মূল অংশে - রসময়ীর ও ক্ষেত্র মোহনের আঠার বছর ধরে বিয়ে হয়েছে কিন্তু কোনো সন্তান নেই। ফলে তাদের দাম্পত্য জীবনকে বিড়ম্বনাপূর্ণ করে তুলেছে। দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে সন্তানের অনুপস্থিতে রসময়ীর মনোজগতে বিশেষ চাপ পড়েছে, মানসিক সন্তাপে সে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। স্বামীকে ঘিরেই তার এই বিক্ষোভ বলয়ের সৃষ্টি। ধীরে ধীরে স্বামীর প্রতি আস্থা হারিয়েছে সে । তার মনে হয়েছে-যে স্বামী তাকে সন্তান সুখে সুখি করতে পারেনি, সেই স্বামীকে সুখ প্রদানে তার কোনো বাধ্য বাধকতা নেই। বিবাহের পর থেকেই দীর্ঘ আঠার বছর ধরে 'তাদের স্বামী স্ত্রীর সংসার 'যুদ্ধ বিগ্রহ ও সন্ধি করিতে করিতেই কাটিয়াছে।' গল্পে রসময়ী এমনিতেই কলহ প্রিয়া, রণরঙ্গিনী নারী। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, মাতৃহৃদয়ের আর্তি সংলগ্ন বিকৃত মানসিকতা। এতোদিনে সন্তানের আশা তাঁর মনে যতটা সচল তার চেয়ে শতগুণ আশংকা তাঁর স্বামী যদি তাকে সন্তানহীনতার অভিযোগে তাকে ত্যাগ করে অথবা অন্য একটা বিয়ে করে । তাই ঝগড়া করে স্বামীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সে নিজে পিত্রালয়ে চলে গিয়েছে । রসময়ী সতীন নিয়ে সংসার মেনে নিতে পারছিল না। তাদের দাম্পত্য জীবনে আর একজন এসে ভাগ বসাবে তাঁর পক্ষে সেটা মেনে নেওয়া একান্তভাবেই অসম্ভব। স্বামীর উপর প্রভাব নেই, তাই সে নিজেই দিদিকে সঙ্গে নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ে আটকাতে গিয়ে উপস্থিত হয় কনের পিতা হরিশ বাবুর বাড়িতে। সেখানে কথা প্রসঙ্গে গৃহিনীর দুইটি বিশেষণ প্রয়োগে (পরিত্যক্তা , দজ্জাল) বিশেষভাবে রেগে যায় রসময়ী। সে, বারান্দার এক কোন হতে একটা ঝাঁটা নিয়ে এসে গৃহিনীকে মারতে শুরু করে। ঝাঁটা মারতে মারতে সে বলে -

"কেন?- কেন ? আর মরবার জায়গা পেলেনা ? জায়গা পেলেনা আমার সোয়ামি ছাড়া কি তোমার মেয়ের অন্য পাত্তর জুটলোনা। জুটলো না ?" [১৪]

রসময়ীর এভাবে রেগে যাওয়ার প্রধান কারণ- "মেয়ের বিয়ের জন্যে তাঁরা তাঁর স্বামী ক্ষেত্রমোহন"-কেই পাত্র নির্বাচন করেছে। সে কারণেই গৃহিনীকে তার অসহ্য লেগেছে। শেষমুহূর্তে সে কনের খোঁজ করেছে। তাকেও কিছু শাস্তি দিতে চেয়েছে। বলেছে-

"কনেটি গেল কোথায়! তাকে একবার বের করনা। চোখ দুটো গেলে দিয়ে যাই। নাকটা কেটে দিয়ে যাই। দাঁতগুলো ভেঙে দিয়ে যাই"[১৫] ইত্যাদি ইত্যাদি।

ক্রুদ্ধ হলেও রসময়ী দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য নয়, লোকজন আসার আগেই সে দিদি বিনোদিনীর সঙ্গে নিয়ে খিড়কির পথে বেরিয়ে চলে এসেছে। রসময়ীর অভিমানের চেয়ে অভিনয়টাই এক্ষেত্রে বেশী। মাথায় আঁশবটি ঘুরিয়ে- 'খুন চেপেছে- আমার খুন চেপেছে-সবাইকে খুন করে ফাঁসি যাব' [১৬]-চিৎকার করে সে সবাইকে ভয় দেখাতে চেয়েছে। মেয়েরা ভয় পেয়ে ঘর বন্ধ করে নিরাপদ হয়েছে। সেই সুযোগে রসময়ীও নিরাপদে ঐ গৃহ ত্যাগ করেছে। সে নিশ্চিত হয়েছে যে, অন্ততঃ হরিশবাবু ও তার গৃহিনী এরপর আর ক্ষেত্র মোহনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হবেনা। তবু সে স্বামীর সঙ্গে দেখা করেছে এবং জানতে চেয়েছে সত্যিই সে বিয়ে করছে কিনা ? এই বলে ক্ষেত্রমোহন উত্তর দিয়েছে- 'করছিই তো। করবনা কেন? তোমার ভয়ে নাকি ?'–এই বলে ক্ষেত্রমোহন উত্তর দিয়েছে-এর পরেই সেস্বামী ক্ষেত্রমোহনকে "আঁশবঁটি দিয়ে মেয়ের নাক কাটার- আর বুকে একখানা দশমুনে পাথর চাপিয়ে দিবার তাঁর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে । ক্ষেত্রমোহন তার নাক কেটে দেওয়ার কথা বললে, সে কোমরে হাত দিয়ে স্বামীর মুখের কাছে মুখ এনে-'এস না! কাট না! তুমিই কাট না হয়!' বলে তাঁর সাহসের পরীক্ষা নিয়েছে। স্বামী তখন চুপ থেকে সজোরে হুঁকা টানতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ ঝুঁকে থেকে ক্লান্ত হয়েই রসময়ী সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তার আসন্ন জয় নিশ্চিত জেনে, বলেছে- "তাহলে আঁশবঁটিতে শান্ দিয়ে রাখিগে? সম্বন্ধ পাকা হলে খবরটা দিও চুপি চুপি যেন শুভ কাজটা সেরে ফেল না।"[১৭] তখন ক্ষেত্র মোহন প্রায় বিপর্যস্ত হয়েই বলেছে- "তুমি না মরলে আর বিয়ে করছিনে। মরবে কবে ?"[১৮] রসময়ী তখন বিদ্রূপের কণ্ঠে হেসে বলেছে-

"আমি মরবো কবে জিজ্ঞাসা করছ? রসি বামনি এমনি মরছেনা। তার এখনও অনেক দেরি-বিস্তর বিলম্ব। তোমার বিয়ে করবার বয়স যাবে- বুড়ো থুড়থুড়ো হবে- ভুঁয়ে মুয়ে হয়ে যাবে- যখন আর কেউ মেয়ে তোমায় দিতে রাজি হবে না- তখন আমি মরব।"[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে আমরা দেখি যে, 'রসময়ীর 'জেদ ও কলহের মধ্যে তাদের বন্ধনহীন দাম্পত্য জীবনের একটা ট্রাজিক দিক আছে, যা তাদের দাম্পত্যের সেতু বন্ধন সৃষ্টিতে বাধা দিয়েছে। সন্তানহীনতায় রসময়ী তার কেন্দ্রবিন্দু খুঁজে পায়নি।

প্রকৃতি অমোঘ নিয়মে রসময়ী চিরবিদায় নিলে; যুদ্ধের একপক্ষ শেষ হয়। সেই সাথে শেষ হয়, ক্ষেত্রমোহন ও রসময়ীর যুদ্ধ বিগ্রহের ও সন্ধি স্থাপনের ঘটনা বহুল দাম্পত্য জীবনও। কিন্তু গল্প শেষ হয় না, একটা রহস্য গল্পকে আরো কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে যায়। গল্পটি এগিয়েছে অনেকটা গোয়েন্দা গল্পের রহস্যময়তার মধ্য দিয়ে। তাতেও দাম্পত্য জীবনের অতৃপ্তির গন্ধ লেগে আছে; মৃত্যুর পরও স্বামী একান্ত নিজের করে রাখার চেষ্টা আছে রসময়ী'র।

গল্পে রসময়ী মারা গেলে, তাঁর স্বামী ক্ষেত্রমোহন তাঁর মুখাগ্নি করেছে। কিন্তু স্ত্রীর অস্তিত্ব বজায় থেকেছে, তাকে সে অস্বীকার করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী রসময়ীর দূরদৃষ্টিই গল্পের পরবর্তী অংশের সঙ্গে পূর্ববর্তী অংশের গ্রন্থিবন্ধন করেছে। এ দূরদৃষ্টি হচ্ছে রসময়ীর অবর্তমানে তাঁর স্বামী ক্ষেত্রমোহনের আচার-আচরণের গতি প্রকৃতি কেমন হতে পারে, সে সম্পর্কে পূর্বে সম্যক ধারণা। রসময়ী জীবিত থেকে তার মৃত্যুর পর ক্ষেত্রমোহনের কাজ-কর্মের একটা নকশা এঁকে ফেলেছে। ফলে স্বামীর দ্বিতীয়বার বিয়ে ঠেকানোর জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কল্পনা করে সে একাধিক চিঠি লিখে রেখে গেছে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ চিঠিটি ডাকযোগে ক্ষেত্রমোহনের কাছে পাঠিয়েছে। আত্মা মৃত্যুহীন বলে- মৃত্যুর পর অতৃপ্ত বিদেহী আত্মার প্রতিহিংসার বহু কিংবদন্তি এদেশে বহুকাল ধরে প্রচলিত। রসময়ী সেই প্রচলিত ধারনাকেই অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে আপন কার্যসিদ্ধির উপায় রূপে গ্রহণ করেছে। সে কারণেই চিঠির প্রেরকের ঠিকানা দিয়েছে- "আমি মরিআছি বটে কিন্তু তাই বলিয়া তুমি নিস্কৃতি পাইআছ তাহা মোনে করিওনা। বাড়ির সনমুখে যে বটগাচ আছে তাতেই আমি আজ কাল বাস করিতেছি।... বিবাহ করিও না, করিলে তোমার নলাটে অসেস দূগগতি আছে।"[২০] প্রথম চিঠিতেই রসময়ী মৃত্যুর পরেও তার অস্তিত্বের এহেন ঘোষণায় ভাবী শশুর নায়েব, হলেও ভয় করে ক্ষেত্রমোহনের । কারণ চিঠিতে রসময়ী জানিয়েছে যে, মাঝে মাঝে সে বটগাছ থেকে নেমে এলে শয়নগৃহে এসে বিছানার চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, সে বড় একলা, তাই তার ইচ্ছে গলাটিপে স্বামীকে মেরে তার সঙ্গী করতে।" কিন্তু বিয়েতে তার যোলআনা লোভ এবং ভাবি শ্বশুরের আশ্বাসে আশীর্বাদ হয়ে যায় ক্ষেত্র মোহনের তখন রসময়ীর লেখা দ্বিতীয় চিঠি যায় তার কাছে-

"এতো সাহস তোমার ? আসিববাদ পজন্ত হইয়া গিআছে। তুমি মোনে করিআছ আমি তোমার জে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা ফাকা আওয়াজ। রসি বামনি তেমন মেয়ে নয়। আমি মানা করা সত্যেও বিবাহ করিবে। এখনও সাবধান হও। এ দুরমোতি পরিত্যাগ কর। নহিলে একদিন গভীর রাত্তিরে তুমি যখন

Dhaka University Institutional Repository

ঘুমাইয়া থাকিবে বটগাচ হইতে নামিয়া বুকে একখান দসমুনে পাতর চাপাইয়া দিব। ঘুম আর ভাঁগিবে না।"[২১]

রসময়ীর প্রতি ভয় আর বিবাহের প্রতি আসক্তি-এ দু'-এর টানাপোড়নে এক বছর কেটে যায়। ক্ষেত্রমোহন তার খুড়ার সঙ্গে পরামর্শ করে গয়ায় পিণ্ড দিয়ে এসে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিল। এর মধ্যে মামলা সংক্রান্ত ঝামেলায় গয়া যেতে দেরী হচ্ছে, এমন সময় রসময়ীর তৃতীয় চিঠি আসলো। "সুনিলাম তুমি না কি গয়ায় আমার পিণ্ডি দিতে যাইতেছে। ভাবিআছ বুঝি পিণ্ডি দিলে আমি উধাও হইয়া যাইব তখন সচন্দে বিবাহ করিবে। গয়ায় যদি যাও তবে চোরের বেস ধরিয়া রেলগাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তোমার বুকে ছোরা বসাইয়া দিব।"[২২] এভাবে পরপর তিনটি চিঠি- পেয়ে ক্ষেত্রমোহন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। খুড়া মশায়ের পায়েও জোর হয় না সামনে যাবার, সরকারী উকিল মনোহর বাবুর ভূততত্ত্বে বিশ্বাস,হস্ত শিল্প বিশারদ সফটমোর সাহেবের, সার্টিফিকেট তিনটি চিঠিই এক হাতের লেখা- ফলে বিষয়টি আরো জটিল হয়ে উঠে এবং বিয়ের সামগ্রিক বিষয়টি যায় চাপা পড়ে। এর পরেই আমরা চিঠির রহস্য উন্মোচন হতে দেখি। ক্ষেত্রমোহনের শ্যালক সুবোধের দোলের বাজী ফাটানোর বিষয়কে কেন্দ্র করে পুলিশ তার শ্বশুরবাড়িতে এসে সার্চ করার সময় অনেক জিনিস পত্রের সঙ্গে" রসময়ীর হস্তাক্ষরে তার নাম ও ঠিকানা লেখা খান কুড়ি সাদা খাম আবিষ্কারের বিষয়টি লক্ষ করি। চিঠিগুলি নানা অবস্থা কল্পনা করে অনুমানে লেখা। কোনটা গয়ার পিণ্ডদান করার পরের অবস্থা কল্পনা করে লেখা, কোনটা বা বিবাহের পূর্বদিনে শেষ সাবধান বাণী।

রসময়ী মৃতা, কিন্তু মৃত্যুর পরও যাতে তার একান্ত কামনা নিষ্ফল না হয়; তারই জন্য বহু পূর্বে চিন্তিত এই কৌশল তার বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক- এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তবু এসব আয়োজন স্বামীর প্রতি রসময়ীর ভালবাসা, নিজের দাম্পত্য জীবনে সন্তানহীন হিসেবে কষ্টে থাকার মধ্যে সামান্য শান্তনা, যা তাকে কিছুটা সুখে মরবার পক্ষে সহায়তা করেছে। "এ গল্পে প্রভাত কুমারের শিল্প দক্ষতা হাস্যরসের এক অভিনব উপাদানকে প্রয়োগ করেছে যা রঙ্গরসের পর্যায়ভুক্ত নয়, মানবিক জীবনসত্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে কালোত্তীর্ণ।"[২৩]

গল্পে ক্ষেত্রমোহন ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল নয়। রসময়ীর স্বামী হিসেবেও সে স্ত্রীর মানোপীড়া লাগবে সহায়কের ভূমিকা নেয়নি। গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যেনো প্রতিপক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ। দুটি পরস্পর অনাসক্ত হৃদয়কে এক সুতায় বাঁধার কোনো আয়োজন অবলম্বন নেই। কেন্দ্রচ্যুত হয়ে দুটি চরিত্রই কেবল নিজ নিজ আবর্তের মধ্যেই ঘুরপাক করেছে।

রসময়ীর কলহপরায়ণা চরিত্রের নেপথ্যে- স্বামীর প্রতি সংসারের প্রতি একটা চিরন্তন আকর্ষণ খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে। স্বামী ক্ষেত্রমোহনের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসাই তাকে অন্য নারীর প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

বিক্ষুব্ধ করেছে। আকর্ষণ আছে বলেই সে অন্য কোন মেয়ের হাতে স্বামীকে ছেড়ে দিতে চায়নি। অন্যদিকে ক্ষেত্রমোহন স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে রসময়ীর মৃত্যুর পরে।

আমরা দেখি যে প্রভাত কুমারের সময়ে নারীর অধিকারহীনতাই সমাজে স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাঁর পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নারীদের অধিকার নিশ্চিত কল্পে তার লেখনিকে হাতিয়ার করে তুলেছিলেন। সেকালে পুরুষ শাসিত সমাজে অধিকারহীনা নারীর যে কোন প্রকারের অধিকার প্রয়োগের ঘটনাই ছিলো সমাজের চোখে নিন্দার বস্তু। পুরুষের কামনা ছিল মনোবৃত্তির অনুগামিনী স্ত্রী। প্রচলিত ছিল- 'নারী বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। এর ব্যতিক্রম হলেই সেই নারী সর্বত্র উপহাসের বস্তু হত। সব যুগেই মধুর স্বভাবা নারী যেমন জন্মায়, তেমনই কলহপ্রিয়া, পৌরুষ প্রধানা, উগ্রচণ্ডী স্বরূপা নারীরও অভাব দেখা যায়না। এদের আচার আচরণ বাক্য বিন্যাস দাম্পত্য কলহ, সুখ-শান্তি অসুখ-অশান্তির নানা চিত্র -বিচিত্র লেখায় ও রেখায় ফুটে উঠেছে, নানা জনের হাতে। ব্যতিক্রমধর্মী এইসব নারী- চরিত্র সামাজিক প্রেক্ষাপটে অসংগতিপূর্ণ বলেই হাস্যরসের আধার হয়ে উঠত, প্রভাত কুমারের রচনাতেও তাই হয়েছে।

৮.

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২) বাংলা ছোটগল্পের প্রস্তুতি পর্বের শিল্পী। পাশ্চাত্য ভাবাঙ্গিক ও মেজাজে পুষ্ট যে ছোটগল্পের ধারা রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তাঁর পূর্বকার গল্প প্রয়াস স্বর্ণকুমারীতে বিদ্যমান। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই সিদ্ধ হস্ত হলেও স্বর্ণকুমারী ছোটগল্পে উষালগ্নে আসর জমিয়ে আপন স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। "মূলত দেশীয় টেল-এর আদলে বৃত্তান্তধর্মী ছোট ছোট গল্প উপাখ্যানের স্বরূপে মুক্তি পেয়েছিল স্বর্ণকুমারীর গল্প প্রতিভা।"[২৪] তার দুটি গল্প গ্রন্থ নবকাহিনী বা ছোট ছোট গল্প এবং মালতী। রবীন্দ্রনাথের দেনা-পাওনা গল্প প্রকাশের (১২৯৮) প্রায় এক যুগ পূর্বে তাঁর মালতী (১২৮৬) প্রকাশিত হয়।এর আগে তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। তাই স্বর্ণকুমারী'র গল্প নিয়ে কথা বলার আগে তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে বলবার অবকাশ থাকে। কারণ তাঁর উপন্যাসের অনেক বৈশিষ্ট্য ও সমস্যাই পরবর্তীতে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে এসেছে বা ঐ সমস্ত গল্পের বিষয় বস্তু উপন্যাসে গিয়েছে। তাই তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারনা না থাকলে গল্পের মূল বিষয়বস্তু বুঝবার পক্ষে ফাঁক থেকে যাবার সম্ভাবনা। কাজেই, স্বর্ণকুমারী দেবীর বাংলা কথা সাহিত্যে কৃতিত্বের দিকটি এবং তাঁর ছোটগল্পে বিষয় আঙ্গিক সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভে উপন্যাসগুলোর পরিচয় অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ।

স্বর্ণকুমারী দেবী, কঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশ দত্ত 'র মত ঐতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক এবং সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন। বিষয়-বৈচিত্রের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত দু'জন স্বর্ণকুমারীর আদর্শ বলা চলে । এদের মধ্যে ভাষার

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী বঙ্কিমের প্রতি বেশী দূর্বল। তাঁর 'ছিন্নমুকুল' 'স্নেহলতা' ও 'কাহাকে'-এ'কয়টি সামাজিক উপন্যাস ছাড়া বাকী সবগুলোই ইতিহাসের পটভূমিকায় রোমান্টিক ও কল্পনাশ্রিত উপন্যাস। কালানুক্রমে এগুলো হলো –*দীপনির্বাণ* (১৮৭৬), *ছিন্ন মুকুল* (১৮৭৯), *মালতী* (১৮৮০), *হুগলীর ইমাম বাড়ী* (১৮৮৮), *মিবাররাজ* (১৮৮৯), *স্নেহলতা* (১৮৯০), *বিদ্রোহ* (১৮৯০), *ফুলের মালা* (১৮৯৫), *কাহাকে* (১৮৯৮), *বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী ও মিলন রাত্রি*।

স্বর্ণকুমারীর দীপনির্বাণ (১৮৭৬ খ্রিঃ) প্রকাশের আগে রমেশ দত্তর মাত্র একটি উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪ খ্রিঃ)' প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি ছিলো ইতিহাসের পটে আঁকা রোমান্টিক উপন্যাস। স্বর্ণকুমারীর '*দীপনির্বাণ*' চিতোর রাজপরিবার এবং মহম্মদ ঘোরির প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা। এটি তার প্রথম উপন্যাস বলেই হয়তো এতে উল্লেখযোগ্য কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না।

কিন্তু তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলো ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে এগিয়ে ত্রুটিমুক্ত হয়েছে। বাংলার পাঠান যুগের ইতিহাসকে আশ্রয় করে লেখা '*ফুলের মালা*'। স্বর্ণকুমারীর '*মিবাররাজ*'এবং '*বিদ্রোহ*' উপন্যাস দুটি রাজস্থানের ইতিহাস অবলম্বন করে গড়ে ওঠেছে। এক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে, রমেশচন্দ্র দত্ত'র আশ্রয় ছিল টডের 'রাজস্থান'।

স্বর্ণকুমারীর প্রথম সামাজিক উপন্যাস '*ছিন্নমুকুল*'। উপন্যাসটি 'ভারতী'-তে ১২৮৫ সালের পৌষ থেকে ১২৮৬ সালের অগ্রহায়ণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে 'স্নেহলতা' উপন্যাসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে সাধারণ বাঙালি জীবনের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। স্বর্ণকুমারী, পরিবার, সংসার, বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, ধর্ম-কর্ম, রীতি-নীতি, আচার-সংস্কার ইত্যাদি সমাজের প্রায় সব উপাদান মিশিয়ে বিশ্বস্ততার সঙ্গে সাধারণ বাঙালির দৈনন্দিন জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার 'কাহাকে' উপন্যাসটি ব্যতিক্রম ধর্মী। এর পক্ষে-বিপক্ষে বহু যুক্তি, তর্কবিতর্ক আছে। এই উপন্যাসের মধ্যদিয়ে স্বর্ণকুমারী জীবন সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রদর্শন করেছেন। নায়ক এখানে স্পষ্ট এবং দূর ভাষায় ঘোষণা করছে, নভেলিস্ট আর নীতিশিক্ষক এক নন, তিনিও নীতিশিক্ষা দেন বটে কিন্তু তাঁর প্রণালী স্বতন্ত্র, তিনি চিত্রকর, বিশ্বের অভঙ্গ অব্যর্থ নিয়মের মধ্যে নিয়তির এবং স্বভাব চক্রের গতিতে চরিত্র ভেদে মানুষ কিরূপ বিচিত্র মূর্তিতে ফুটে ওঠে তাই ছবির মত এঁকে দেখানই নভেলিষ্টের কাজ। 'স্বর্ণকুমারী সেই চিত্র আঁকতে গিয়ে কতটা ব্যর্থ বা সফল হয়েছে সেটার চেয়েও বড় কথা তিনি বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা রাখতেন। তিনি নিজেই 'অ্যান আনফিনিসড সঙ' নামে এই 'কাহাকে' উপন্যাসটি অনুবাদ করেছিলেন। এবং সেটি ইংরেজি জানা পাঠক মহলে বেশ সাড়াও জাগিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে সার্থক মহিলা উপন্যাসিকের মর্যাদাটি তাঁর। ''মহিলা ঔপন্যাসিদের মধ্যে সর্বপ্রথম পথ নির্দেশের কৃতিত্ব কাহার তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া কঠিন। তবে রচনার উৎকর্ষ ও পরিমানের দিক দিয়া এ বিষয়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর নামই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।'[২৫] স্বর্ণকুমারীর

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- "কাহিনী গ্রন্থনে ও চরিত্র সৃষ্টিতে সেকালের পুরুষ ঔপন্যাসিকদের কারও চেয়ে তিনি দূর্বল নন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যেতে পারে। স্বর্ণকুমারীর রচনায় প্রায়শই একটা পুরুষালিভাব চোখে পড়ে, তার ফলে তার অধিকাংশ গল্প উপন্যাসে নারী- লেখিকার স্নিগ্ধ স্পর্শ বড় একটা পাওয়া যায় না। তা সে যাই হোক উনবিংশ শতাব্দীর নারী জাগরণের কেন্দ্রস্থলে যে স্বর্ণকুমারী বিরাজ করছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।" [২৬]

স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসগুলিতে ঐতিহাসিকতার পাশা পাশি একটা শান্ত অথচ দ্যুতিময় প্রকাশ লক্ষ করা যায়। ফলে সেগুলো বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশ চন্দ্রের অনুবর্তী হওয়া সত্ত্বেও প্রেমের কোমল স্পর্শে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করেছে। তাঁর কথা সাহিত্যের অন্যতম এই বিশেষ দিকটি তাঁর গল্পের উপরও রেখাপাত করেছে। উপন্যাসের মত ইতিহাস এবং সমাজ উভয় বিষয়েই গল্প লিখেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী। কিন্তু সবক্ষেত্রেই তাঁর শিল্পের প্রকরণে উপস্থিত হয়েছে নারী। সমাজ লাঞ্ছিত নারী ব্যক্তিত্বের বেদনা, নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, প্রেম, সংসার, দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের টানা-পোড়েন ইত্যাদি সমানভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। আর উপলব্ধি করবার মতো প্রজ্ঞা তিনি পেয়েছিলেন ঠাকুর বাড়ীর মতো জ্ঞান মন্দিরের সৌম্য পরিবেশ, তাঁর পিতা, দাদা, স্বামী, নিজের সুশিক্ষা এবং বঙ্কিম উত্তর সাহিত্য শিল্পী হবার সুবাধে। বস্তুত নারীর গোপন বেদনার অনায়াস- চিত্রণেই তিনি অতুলনীয়া হয়ে

উঠেছেন।' তাঁর 'যমুনা' গল্পটি এমনি একটি গল্প। 'যমুনা' গল্পে, পুরুষ প্রধান সমাজের হাতে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত এক নারীর করুণ গাথা তুলে ধরেছেন স্বর্ণকুমারী। 'যমুনা'র বাবার মৃত্যুর পর সে এবং তাঁর মা, ভাগ্যের হাতে নয়, আত্মীয় পুরুষদের হাতে কিভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত, আপন সম্পদ গ্রহণের অধিকার থেকে কিভাবে বঞ্চিত হয়েছে তাঁর নিখুঁত বর্ণনা আমাদের আকৃষ্ট করে। গল্পে পুরুষের বর্বরতা একেবারে অনাবৃত ভাবে উপস্থিত। যমুনা যাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে ছিল । যিনি অচেনা অজানা পথিক অতিথি রূপে তাদের দরিদ্র জীবন সংলগ্ন হয়ে দিনে দিনে অনাবিল সেবা ও সাহচর্য পেয়েছেন– রোগশয্যায় যমুনা যাকে হৃদয় দিয়েছে এবং হৃদয় নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর হাতেই জীবনের রূঢ়তম লাঞ্ছনার শিকার হয় সে। কারণ মিথ্যা পরিচয় দিয়ে তিনি যমুনাকে লাভ করেছিলেন। আর বাড়িতে গিয়ে নিজের স্ত্রী-কে দাসী বলে যমুনার পরিচয় দিয়েছিল। নারী ধর্মের এহেন অপমান সহ্য করতে পারে নি যমুনা। তাই হিন্দু নারীর পক্ষে শ্রেষ্ঠতীর্থ পতিগৃহ জানা সত্ত্বেও সে তা ত্যাগ করে গোপনে চলে এসেছে। যদিও তাঁর স্বামী বার বার তাকে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে। যমুনা দ্বিতীয়বার স্বামীগৃহে যাবার আগে তাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে "স্ত্রীর সম্পর্ক তিনি আর দাবী করতে পারবেন না। কারণ যে স্বামী 'স্ত্রীর' মর্যাদা দিতে জানেনা, সেখানে স্বামী-সঙ্গচারণ যমুনার কাছে ব্যভিচার বলেই মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তাই সে স্বামীর ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে বেরিয়েছে' কারণ 'স্বামী অপরের কাছে'- এই বলে সে অন্যদের পরিচয় দিয়েছে। পরিশেষে শ্মশান ভূমিতে যমুনার জীবন্ত জীবনাবসান পুরুষ শাসিত সমাজের বর্বরতার বিরুদ্ধে নারী চেতনার তীব্র ধিক্কার মনে হয়েছে আমাদের। এবং গল্পের আদ্য-প্রান্ত রচনায় সংযম এবং নারী প্রকৃতির স্বভাব উন্মোচন পুরুষের চোখে জীবনের এক নতুন রূপ যেন এঁকে দিয়েছে। 'এই অপরিচিত স্বাদুতার দোলাই স্বর্ণকুমারীর কোনো কোনো ছোট ছোট গল্পকে 'যমুনা'র মতোই ছোটগল্প করে তুলেছে।'[২৭] সামাজিক বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি ঐতিহাসিক উপন্যাস এর গল্প চিত্রণের বেলাতেও স্বর্ণকুমারী নারীত্বের স্বভাব বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। 'কুমার ভীমসিংহ' গল্পে আমরা দেখি যে, এর অতি উজ্জ্বল দিকটি-'ভীমসিংহের' রাজপুত সমুচিত স্বার্থত্যাগ ও আত্মদান নয়, ভীমসিংহ জননী কমলকুমারীর ব্যাথা বিগলিত নারীধর্মের সহজ সাবলিল এবং ব্যঙ্গময় উপস্থাপনার দিকটিই মুখ্য। গল্পে আমরা দেখি পতি সোহাগ বঞ্চিতা চিরমৌনা এক নারী চরম মুহূর্তে পুত্রের ন্যায্য অধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে, অতীতের সমস্ত মান-অভিমান, ক্ষোভ, ভুলে কিংবা বুকে চেপে এসেছে স্বামী-সন্দর্শনে। একথা, ওকথা করে অনেক কথা হয় তাদের, হঠাৎ মহিষী বলেন-

"কুমারদের জন্মদিনের কথা মনে পড়ে কি ? বলিতে বলিতে মহিষীর কথা বাধিয়া গেল, আর বলিতে পারিলেন না, মুহূর্তে বিশ বৎসর যেন পিছাইয়া পড়িল, তখনকার ঘটনা নূতন হইয়া তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। সেই দিনের সরলা বিশ্বস্ত হৃদয়া, অভিমানিনী বালিকা বধূতে আর আজিকার এই পৌঢ়া, স্বামী প্রেমবঞ্চিতা, দলিত প্রাণা রাজরাণীতে কত তফাত।[২৮]

আজিকার এ মর্মাহত, গর্বিত কমলকুমারী নহেন- সেদিন যেন আর এক কমলকুমারী নব-প্রসূত সন্তান ক্রোড় দেশে লইয়া প্রেমপূর্ণ উৎসুক হৃদয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন- প্রসবের যন্ত্রণা আর তাহার মনে ছিলনা, পুত্রমুখ দেখিয়া স্বামী কতনা আহ্লাদিত হইবেন- কিরূপ উৎফুল্ল হৃদয়ে না জানি তিনি নব শিশুকে ক্রোড়ে লইবেন- এই ভাবিয়া হৃদয়ে সুখের উৎস বহিয়া যাইতেছিল।"[২৯]

কিন্তু ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসে তার আনন্দ অপেক্ষার প্রহর। প্রত্যাশিত স্বপ্ন-সুখের বদলে, নেমে আসে অসুখের ঝড়। ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে কমলকুমারী। ঠিক তখন দাসীর মুখে খবর পায় সে- 'রানী চঞ্চল কুমারীর এই মুহূর্তে একটি পুত্র সন্তান হইল, মহারাজ তাহার পদে অমর কবচ বাঁধিয়া দিতেছেন। সেখান হইতে এখানে আসিবেন।'[৩০] চঞ্চলকুমারী, কমলকুমারীর সপত্নী । -এভাবে চমৎকার হয়ে উঠেছে, নারী বাসনার স্নিগ্ধ উল্লাস, বেদনা, নিঃসাড়, অবসাদ-এর মত বিষয়গুলো স্বর্ণকুমারী দেবীর নারী শিল্পী মনের একান্ত অনুভবে, অনুধ্যানে । এবং গল্পে ইতিহাসের প্রতি বিশ্বাসবোধের কোথাও ফাঁক নেই । এখানেই গল্পকারের যথার্থ কৃতিত্ব ।

স্বর্ণকুমারী দেবীর 'নবকাহিনী'র 'গহনা' গল্পটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। গল্পটিতে ফরাসী গল্পের প্রভাব লক্ষ করা যায় । ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি ছেলেদের বিলেতে যাত্রায় অভিভাবকদের প্রধান আশঙ্কা

Dhaka University Institutional Repository

ছিল পুত্রের বিবাহ । সেই রকম একটি ঘটনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এ গল্পের কাহিনী। অতি সামান্য এক কেরানী বহু কষ্টে পুত্রকে বিলেত পাঠায় এবং তার প্রতিবেশিনীর মেয়ে ভবানীর সঙ্গে ঐ পুত্রের বিবাহ স্থির করে । যথাসাধ্য উপহার দান- প্রদানের মধ্য দিয়ে বেড়ে চলে তাদের পারিবারিক সম্পর্ক । এদিকে ছেলে যখন দেশে ফিরে তখন জানা গেল সে বিলেতে বিয়ে করে এসেছে । পুরো কাহিনী জুড়ে একটা নির্মমতার সুর লক্ষ করা যায় । রমণীয় হয়ে উঠবার আগেই বিলেত- ফেরত পুত্রের আচরণ কাহিনীটিকে প্রচণ্ড আঘাতে, ক্ষত-বিক্ষত করেছে । বাঙালি ঘরের অর্ধ-শিক্ষিত মেয়েটি লজ্জায়-সংকোচে আড়ষ্ট জড়ো সড়ো হয়েছে। আর দরিদ্র পিতা হয়েছে বাকশূন্য। তাঁর 'নির্বাক চাহনি কাহিনীটিকে মৃতব্যক্তির নিস্পলক নয়নের শূন্যতায় ভরিয়ে তুলেছে।'[৩১] গল্পটি সবচেয়ে বেশি করুণরস ঘন হয়ে তখন, যখন চোখের অনেক জল আর দুঃখ-বেদনার সঞ্চয়, নববধূর জন্য সামান্য গহনা (দুইগাছি বালা) নিয়ে জননী সানন্দে নব বধূর ঘরে ঢুকলেন। ততক্ষণে সেই বধূ ম্লান অপমানে সেখান থেকে চলে গেছে। বৃদ্ধ পিতা স্তব্ধ, পুত্রও স্থির –এই পাষাণ পাথর মৌনতার উপর মাতৃস্নেহের অমিয় ধারা প্রবাহের আগেই স্বর্ণকুমারী বিহ্বলা জননীকে তার একান্ত আত্মবেদনাসহ আমাদের কাছ থেকে আড়াল করে কাহিনীর ইতি টেনেছেন।এটি তাঁর প্রথম গল্প যেখানে তিনি গল্প বলার নানা কৌশল, গল্পের প্লট রচনার ও চরিত্র নির্মাণের দক্ষতা, ইঙ্গিতময়তা, সমাপ্তির মধ্যে আকস্মিকতা সৃষ্টি ইত্যাদি পূর্ণভাবে আয়ত্ত্ব করেছেন। এবং কোথাও অপ্রয়োজনীয় বাক্‌বিস্তারে কাহিনী বিপথে গতিশীল না হয় সে দিকে মনোযোগী হয়েছেন। ফলে এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা মর্যাদা পেয়েছে। স্বর্ণকুমারীর 'পেনে প্রীতি'র কাহিনীর প্রথম পর্বের সঙ্গে গল্পের কোনো যোগ না থাকায় গল্পটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনার মর্যাদা হারিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাঁর 'অমরগুচ্ছ' একটি সুন্দর গল্প । এতে এক বিধবার নিঃশব্দ প্রেম অকলঙ্ক স্মৃতিচিহ্ন রূপে উপস্থাপিত। বিধবা তরুণী তার দাদার বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে সেখানে অমর ফুল দেখতে পায়। ঐ বন্ধু বহু কষ্ঠে সেই ফুল সংগ্রহ করে তাকে উপহার দেয়। তখন তাঁর সুপ্ত নারীত্ব হঠাৎ জেগে উঠে। সে ভাবে পুরুষের এই দুঃসাহস, এই দুর্জয়শক্তির উপহারের লক্ষ্য একমাত্র তাঁর নারী হৃদয়। তারপর ঐ বন্ধু চলে গিয়ে বিয়ে করে। কিন্তু বিধবা মেয়েটি সেই 'অম্লান অমর ফুল' যত্ন করে রেখে দেয়, এবং ছ'মাস পরে ঐ বন্ধু স্বপত্নীক আবার বেড়াতে এলে তাকে সেই ফুলগুলি ফিরিয়ে দেয়। এখানে ফুলগুলি ফিরিয়ে দেবার মধ্যে এক অতৃপ্ত আত্মার তীব্র চাপা অভিমান এবং ক্ষণপ্রেমের মহিমা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখি ।

স্বর্ণকুমারী দেবী'র 'মিউটিনি'–গল্পটি এক ধরনের আত্মকথন বলা যেতে পারে। তাঁর জীবন চর্চার প্রেক্ষিতে গল্পটিতে বাস্তব ঘটনার প্রতিফলন বেশি। এতে তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্র দুটি মিসেস-'এ' এবং গল্প কথক। গল্প বিশ্লেষণে দেখা যায় উপরোক্ত দুটি চরিত্রই 'মিউটিনি'' নামক ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

Dhaka University Institutional Repository

কাহিনীটি বাহুল্য বর্জিত এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের ঢঙে সহজ ভাষায় সরলভাবে উপস্থাপিত। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের ভাষার সঙ্গে মিলে যায় কতকটা । এর আখ্যান ভাগটি একটি বিশেষ বিষয়ের উপরে বেশি আলো ফেলেছে–তা হলো ভিনদেশী-বিদেশীদের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে দেশবাসীর গৌরব প্রতিষ্ঠা করা ।গল্পে আমরা দেখি যে মিসেস–'এ' শুরুতেই আত্মপ্রচার এবং স্বজাতির গৌরব প্রচারে ব্যগ্র

এবং সেই- সূত্রে মিউটিনি'র প্রসঙ্গ এলে মিসেস-এ কতৃক সেটাকে ছোট করে দেখার ইঙ্গিত,আরো পরে প্রণয় ঝামেলাকে বিদ্রোহ মনে করে নিজে মুচ্ছিত হওয়া। এই ভাবে উপস্থাপিত কাহিনীর মূলস্রোত মিউটিনি তথা বিদ্রোহ ।অন্যদিকে গল্প কথক চরিত্র নিজ জাতি ও দেশের যে মাহাত্ম্য প্রচার করেছে ও রক্ষা করতে চেয়েছিল তা রক্ষিত হয়েছে এই মিউটিনির কাছে মিসেস-এ' এর হেরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে।আমাদের মতে মিউটিনি স্বর্ণকুমারী দেবরি সমাজ এবং ইতিহাস বিষয়ক গল্প। আর গল্পের বিষয়সত্যের কেন্দ্র-কথাটি হল- বিদেশী ও দেশীর নারীত্বের তুলনামূলক উপস্থাপনার মাধ্যমে ভারতীয় নারীর, সমসূত্রে সমগ্র ভারতীয় জাতির গৌরব প্রতিষ্ঠা । গল্পটি একাধারে স্যাটায়ার ও আয়রনির মাধ্যমে পরিবেশিত । কেননা যে পুরুষের প্রণয় কলহের মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহের আক্রমণ প্রত্যক্ষ করে মূর্ছা যায়, তার মুখে'র–'তিনজন ফ্রেঞ্চম্যান পাঁচজন জর্মানের সমান আর একজন ইংরাজ সেই তিনজন ফ্রেঞ্চম্যানের সমান।'[৩২] এই কথাগুলো তার চরিত্রের অন্তঃসারশূন্য মেকি অস্তিত্বেরই প্রকাশক ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়। এ গল্পে আমরা পরাধীনতার যে আক্ষেপ দেখি, তা হৃদয়কে সংঘবদ্ধ করবার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ছোট গল্পগুলির মধ্যে যেখানে 'আগাগোড়া' স্ত্রীলোকের সুর ধবনিত প্রতিধবনিত হয়েছে সেখানেই তিনি স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন।

৯.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ১২৯৯-এর জৈষ্ঠ মাসে 'একরাত্রি' গল্পটি লিখবার সময়ই গল্প লেখার প্রতি তাঁর সুতীব্র আকর্ষণ ও আগ্রহের কথা প্রকাশ করেছিলেন কবিতায়–' ইচ্ছে করে অবিরত আপনার মনোমত/ গল্প লিখি এক- একটি করে,

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারটি অশ্রুজল ।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘন ঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ,

Dhaka University Institutional Repository

অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইলনা শেষ ।'' [৩৩]

-এভাবে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ছোট গল্পের স্বরূপটি প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ। যা ছোট গল্পের চরিত্র সম্পর্কে বুঝবার পক্ষে আমাদের জন্য যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথেই বাংলা ছোটগল্পের প্রকৃত প্রাণ প্রতিষ্ঠা । তবে সেই প্রাণকে স্বাগত জানানোর আয়োজন শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। যদিও তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যাকাশে ক্ষণিকের বিদ্যুৎ চমকানোর মতই ঠেকে আমাদের কাছে । প্রাক রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প পর্যায়ে অন্য আর একটি বিষয় আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ করেছি –গল্পকাররা শুরুতে উপন্যাস লিখেছেন, পরে অবসর সময়ে ছোট ছোট গল্প লিখতে সচেষ্ট হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেটা হয়েছে সমান্তরালভাবে, "অনেকগুলি স্রোতধারা (কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প) নিয়ে মহা জলদির দিকে তাঁর মহাযাত্রা।"[২] তবে তিনি ছোট ছোট গল্প না বলে 'ছোটগল্প' নামকরণ করে একে সার্থক করে তুলেছেন।

আমাদের জানা আছে যে, রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মাধ্যমে বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাতে বৃহৎ জীবনের লীলা-বৈচিত্র,ঘটনা-তরঙ্গ, বিভিন্ন সমস্যা-জটিলতা বিচিত্রভাবে চিত্রিত হয়নি । অর্থাৎ তিনি তাঁর উপন্যাসের উপাদান খুঁজেছেন আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বাইরে, ইতিহাসের অন্দরে- বন্দরে । যে কারণে তাঁর উপন্যাসগুলোতে ঐতিহাসিক স্থানের উপস্থিতি বেশি । চিরঅবুঝ মানুষসহ চিরসবুজ বাংলাদেশ সেখানে গড়হাজির। যদিও বিষবৃক্ষ, স্বর্ণলতা ও কৃষ্ণকান্তের উইল–এ, এর কিছু কিছু চেষ্টা আছে । কিন্তু আমাদের জীবনের বাইরে - সহজ,সুলভগোচর দিকটি ছাড়াও একটি গোপন নিভৃতগোচর দিক আছে। যা দেখতে হলে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সহানুভূতিসম্পন্ন হৃদয় দিয়ে দেখতে হয়। সেভাবে দেখবার উপকরণ ও আয়োজন তাঁর যথেষ্ঠ পরিমাণে ছিল বলে প্রমাণ পাই না। কাজেই "বঙ্কিমবাবু ঊনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক বাঙালির কথা যেখানে বলেছেন, সেখানে কৃতকার্য হয়েছেন, কিন্তু যেখানে পুরাতন বাঙালির কথা বলতে গিয়েছেন সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে; চন্দ্রশেখর, প্রতাপ প্রভৃতি কতগুলি বড় বড় মানুষ এঁকেছেন (অর্থাৎ তাঁরা সকল -দেশীয় সকল-জাতীয় লোকই হতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে দেশ কালের বিশেষ চিহ্ন নেই) কিন্তু বাঙালি আঁকতে পারেননি। আমাদের এই চিরপরিচিত, ধৈর্য্যশীল, স্বজন-বৎসল, বাস্তভিটালম্বী, প্রচণ্ডকর্মশীল পৃথিবীর একপ্রান্তবাসী শান্ত বাঙালির কাহিনী কেউ ভালো করে বলেনি।"[৩৪] তাছাড়া তাঁর সাহিত্যে যুগ-স্বভাবের পরিচয় নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন, সেকালের অনেক প্রতিভাবান।

'বঙ্কিম যে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা লিখেছিলেন,সে সব কি সত্যি ছিল ? সে-সব - romantic situation কি তখন ঘটতে পারতো ? সত্যি হচ্ছে এই যে, তিনি পড়েছিলেন ইংরেজি রোমান্স, পড়ে

Dhaka University Institutional Repository

ভালো লেগেছিল। তাঁর বইগুলোতে যে-সব কাণ্ড -কারখানা আছে, সেগুলো তাঁর স্মৃতির মধ্যেও ছিলনা।'[৩৬]

বস্তুত বাঙালির জীবন শিল্প রচনার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক বঙ্কিম ছিলেন অনাগত-বিধাতা । তাঁর যুগের নগর-বাংলায় ইংরেজি শিক্ষিত নর-নারীর ভাবালোকে নবীন আর্দশের আবেগ- অভিঘাত সদ্য ফেনিল হয়ে উঠেছিল ; যুগ প্রাচীন সমাজ-সংস্কারের প্রতিক্রিয়াশীলতা সেই ভাবাবেগকে ক্ষনে ক্ষনে তপ্ত-ক্ষুব্ধ করেও তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু পুরাতনের সঙ্গে নতুনের সংঘাতের প্রত্যক্ষতা বাস্তব জীবন-ভূমিতে তখনও অপরিহার্য হয়ে উঠেনি । তার অসংখ্য কারণ ধরা আছে সেকালের সাক্ষী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ।

> 'উনিশ শতকে রামমোহন রায় থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত প্রতিভা প্রবাহের সাধনায় যে রেনেসাঁস-এর জন্ম, বিকাশ, এবং পরিণতি, তার সর্বাঙ্গে বহুমুখী সম্ভাবনা উত্তুঙ্গ হয়েছিল। তাহলেও, তারই মূলে অন্তর্নিহিত ছিল একান্তবদ্ধতা এক অনপনেয় সীমায়তিও। এই রেনেসাঁস-এর ফসল বাঙালি জীবনের সকল স্তরকে স্পর্শও করতে পারেনি ; প্রধানভাবে কলকাতা, এবং অংশত অন্যান্য কয়েকটি মাত্র শহর উপনগরের সংকীর্ণ সীমায় একান্তভাবে বাধা পড়েছিল। নাগরিক জীবনের বাইরে বৃহত্তম বাঙালি সমাজ অসংখ্য পল্লীতে ছিল সার্বিক অন্ধকারে নিমজ্জিত। কেবল গ্রামেই নয়, শহর -নগরেও একমাত্র ইংরেজী শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাইরে উনিশ শতকের নব- জাগরণের কোনো প্রভাবই ছিলনা। বাঙালি সমাজের এ ছিল একভাবে সমতাহীন অদ্ভুত অবস্থা। বাংলার শহর -নগর তখনও এমনই অপূর্ণগঠিত ছিল যে , গ্রাম ও শহরের মধ্যে তফাত খুব দূরবর্তী ছিলনা। তাছাড়া নিছক দৈহিক অবস্থানের দিক থেকে গ্রাম ও শহর তখনো ছিল ঘন-সন্নিবদ্ধ। তবু মন ও মননের জগতে এদের পার্থক্য ছিল আমূল। স্বয়ং রামমোহন রায় জন্মসূত্রে ছিলেন গ্রামীণ; তাঁর প্রথম জীবনের কর্মক্ষেত্রও বহুলাংশে পল্লীবাংলায় প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু যেদিন থেকে রামমোহন নব-বাংলার বৈপ্লবিক সংগঠকের ভূমিকা নিয়েছেন, তার আগে থেকেই তিনি কলকাতার নাগরিক । কেবল বাসস্থানেরর দিক থেকেই নয়, মননচিন্তার ক্ষেত্রেও কলকাতার বাইরেকার বাঙালি সমাজের অস্তিত্ব তাঁর ভাবনায় সর্বদাই ছায়া ফেলতে পারেনি। অথচ বৈষয়িক কর্মসূত্রে এঁদের সঙ্গে এককালে তাঁর যোগ ছিল প্রত্যক্ষ। সে কালের সংবাদপত্রে প্রথমাবধি পল্লীবাংলার দুর্নীতি ও দুর্গতির সংবাদ বহুল প্রকাশিত হয়েছে।'[৩৭]

অথচ সে-সবের সুরাহা বা প্রতিকারের জন্য বাস্তব ভিত্তিক কোনো অভিযান পরিচালিত হয়নি। এমন কি এ সম্পর্কে কোনো বিচার- আন্দোলনও অতিক্রম করতে পারেনি শহরের সীমা। সেই অবস্থায়,অবস্থার পরিবর্তনের জন্য, শূন্যতা পূরণের গুরু দায়িত্ব নিতে দেখি রবীন্দ্রনাথকে। 'রামমোহন থেকে যে

Dhaka University Institutional Repository

নবজন্মের সাধনার ধারা চলে আসছিলো, সেই চলমান প্রবাহ থেকেই বেরিয়ে এসেছেন তিনি-অথচ সেখানেই থেমে যাননি,সেই প্রবাহকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন প্রায় অকল্পনীয় দূরত্বে ও বিস্তারে। যুগকে একান্তভাবে স্বীকার করে নিয়ে তাকে অতিক্রমণের অক্লান্ত ও অনিবার প্রচেষ্টাই কবির দীর্ঘ জীবনের বহুমুখী সৃষ্টিময়তার নিহিতার্থ। এক কথায়, "রবীন্দ্রনাথ যেমন রেনেসাঁসের সৃষ্টি, তেমনি রেনেসাঁসের সুদূরপ্রসারী পরিণতি রবীন্দ্রনাথের সাধনকীর্তি।"[৩৮]

বিশেষ করে আমরা দেখি যে-'রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সংকীর্ণ ও অকিঞ্চিৎকর বর্হিবিকাশের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া জীবনের তলদেশে যে নিভৃত ফল্গুধারাটি তাহা আমাদের দেখাইয়া দিলেন। দেখিলাম সেখানে ঘরের কোনে নদীর ঘাটে, সহস্র তুচ্ছ পরিচিত আবেষ্টনে কত সহস্র তুচ্ছ ঘটনা খুঁটিনাটি উপলক্ষ করিয়া আমাদের জীবনে বিচিত্র আশা-আকাঙক্ষা অবিরত স্পন্দিত হইতেছে, অসংখ্য ক্ষুদ্র বিক্ষোভ আন্দোলিত হইতেছে।আমাদের দৈনন্দিন কার্যের মধ্যে সেখানে অপরূপ মাধুর্য সুগভীর ভাবরসে বিধৃত হইয়া আছে। আমাদের বৈচিত্রহীন বাহিরের জীবন সেখানে বৈচিত্রে ভরপুর , আবেগে চঞ্চল,সেখানে তাহার কোনও দৈন্য নাই, কোন অভাব নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিচিত্তের অপূর্ব সুগভীর সহানুভূতি ও সূক্ষ্ম অন্তদৃষ্টি দিয়া আমাদের জীবনের এই নিভৃত গোপন প্রবাহটি আবিষ্কার করিয়া তাহাকে আপন ভাব ও কল্পনায়,রূপে ও রসে আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। আমরা একটি নূতন জগৎ ও জীবনের সন্ধান "আধুনিক পৃথিবীর নানা অসংগতি, সংশয়, যন্ত্রণা ইত্যাদি তাকে পীড়িত করলেও তিনি ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নিয়ে সেই আধুনিকতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । তাঁর লেখায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে, সেকালের সমাজ স্বদেশ সম্পর্কে ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নানা দর্শন। কিন্তু এ-সবের কারণে তাঁর কবি সত্ত্বা, তাঁর চির ভাবুক-হৃদয় হারিয়ে যায়নি,তাঁর সীমার মধ্যে অসীমের আরাধনা নষ্ট হয়নি,তাঁর জীবন দেবতা তাকে অভিসম্পাত করেনি,এমন কি শ্যামল প্রকৃতিও ছেড়ে যায়নি তাঁকে । বরং সেসব এসে এক স্রোতে মিলেমিশে কল্যাণ সমুদ্রের দিকে স্ববেগে গতি প্রাপ্ত হয়েছে । সেই গতি মুখে আমরা আত্ম আবিষ্কার করেছি। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, ভালো-মন্দ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব , ঘাত-প্রতিঘাত, স্বাধীন-পরাধীন প্রভৃতিকে নতুনভাবে অনুভব করতে শিখেছি। গৃহধর্ম ও গৃহকর্মে সেগুলোর প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহার-অপব্যবহার ইত্যাদি বুঝতে সচেষ্ট হয়েছি। তিনি কাল-সমাজের অনেক যন্ত্রণা , অনেক বাধা অতিক্রম করে তাঁর সৌন্দর্যবোধকে আমাদের সামনে প্রকটিত করেছেন । নব নব আলোক সম্পাত করে ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করেছেন । তার নিরংকুশ প্রমাণ মিলে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের আপাদ-মস্তকে।"[৪০]

আমরা দেখেছি যে, রবীন্দ্র সাহিত্যে কল্পনার আশ্রয় থাকলেও কখনো তা মানুষকে বাদ দিয়ে নয়। কি কবিতায়, কি গানে, কি নাটকে ,কি উপন্যাসে, কি ছোটগল্পে সবটাতেই মানুষই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথের মানুষ ভিন গ্রহের, বিদেশী বিভাষী কেউ নয়-তারা একান্ত চেনা জগতের ,অতি পরিচিত, বাংলাদেশের অতি সাধারণ মানুষ। (কৃষক, জেলে, মাঝি, শিক্ষক, কেরাণী, উকিল,মোক্তার , মালি, মহাজণ,)এই সাধারণের মধ্য থেকেই তিনি এক এক জনকে চেতনা দিয়ে প্রদীপ্ত করে- মহৎ করে, বড় করে, কল্যাণকর করে গড়ে তুলেছেন । এবং তা করেছেন যুগ –জগতের চাহিতা মত, জীবনের উদ্দেশ্যে। খেয়ালের বশে নয়। কেননা কোনো মহৎ প্রতিভাই জীবন বিচ্ছিন্ন নয়, নয় দেশ-কালের প্রভাব মুক্তও ।

তাঁর কথা সাহিত্যে -'বঙ্কিম রীতিকে অনুসরণ করে লেখা '*বউঠাকুরানীর হাট*' ও '*রাজর্ষি* উপন্যাস দুটি বাদ দিলে, বাকি সব উপন্যাসের ক্ষেত্রই নগর ও নাগরিক জীবন । এবং এসবের পাত্র-পাত্রীরাও এক একজন বিদগ্ধ নাগরিক। উপন্যাসে আধুনিক মুল্যবোধ ও মনস্তত্ত্বের আলোচনা, চরিত্রায়ণের নতুন রীতি রবীন্দ্রনাথের লেখনীর আশ্রয়েই বিকাশ লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে সমকালীন সমাজ-দেশের নানা অসংগতি, সংশয়, যন্ত্রণা ইত্যাদিকে তুলে ধরেছেন। এবং তা করেছেন-আমাদের প্রতিদিনকার সুখ-দুঃখ, বিশ্বাস -সংস্কারকে সামনে রেখে, অতি চেনা-জানা নানা রকম চরিত্রের সমন্বয়ে। ফলে তাতে প্রেম-বিরহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, দাম্পত্য -জীবন , সমাজ পরিবারের বিচিত্র বিষয় বিশেষ স্থান করে নিয়েছে । নারী-পুরুষ, তাদের পরস্পরের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ও স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । বিশেষ করে নারী চরিত্রগুলো আত্মসচেতন, জীবনমুখী ও আপোষহীন ব্যক্তিত্ব নিয়ে মুক্তির আনন্দে বিভোর হয়েছে। '*চোখের বালি*'র-বিনোদিনী, '*ঘরে-বাইরে*'র-বিমলা, '*চতুরঙ্গ*'র- দামিনী, '*যোগাযোগ*'র- কুমো, '*শেষের কবিতা*'র লাবণ্য, '*দুইবোন*'র-উর্মিলা, '*চার অধ্যায়*'র-এলা, -তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

'*চোখের বালি*'-তে আমরা দেখিছি যে, মহেন্দ্র'র সাথে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা বিনোদিনীর বিয়ে হবার কথা থাকলেও, তা হয়নি। সম্ভবত দুর্বল-চিত্ত মহেন্দ্র'র ব্যক্তিত্বহীনতাই এর জন্য দায়ী। কেননা, জৈবিক তাড়না ছাড়াই ব্যক্তিত্বময়ী বিনোদিনী মহেন্দ্র'র দুর্বল ব্যক্তিত্বের কারণে সহজেই তাকে পথভ্রষ্ট করেছে। এবং দৃঢ়চিত্ত, ব্যক্তিত্ববান সুপুরুষ বিহারীকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও সম্ভব করে তুলেনি সে। এলাহাবাদের নির্জন ঘরে সব কথা শুনে, যখন তার প্রতি বিশ্বাসে, প্রেমে-বিহারী তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, তখন সে সম্মত না হয়ে বলেছ-

"... ছি ছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে । তোমার ঔদার্যে সব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি একাজ করি, তোমাকে সমাজে নষ্ট করি , তবে ইহজীবনে আমি আর মাথা তুলিতে পারিব না।.. ভুল করিয়ো না, আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে, আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব।"[৪১]

Dhaka University Institutional Repository

এখানে অকাল বৈধব্যের কারণে অতৃপ্ত বিনোদিনী আত্মতৃপ্তি চায়নি, চেয়েছে- আত্মমর্যাদা সম্পন্ন প্রেমের স্বীকৃতি,তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি। সেটা সে মহেন্দ্র এবং বিহারী দুই পুরুষের কাছ থেকেই সে আদায় করে নিয়েছে। এবং নিজের ইচ্ছে মত দুজনকেই এক সময় দূরে ঠেলে দিয়েছে । যদিও 'আশা মহেন্দ্র'র' সুখময় দাম্পত্য জীবন দেখে ঈর্ষান্বিত হয়েছে।

'চতুরঙ্গ' - উপন্যাসে দামিনীকেও আমরা বিনোদিনীর মতোই দেখেছি। "বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলি ভরপুর হইয়া উঠিতেছে, সে কিছুই ফেলিতে চায়না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ, সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকিপয়সা খাজনা দিবেনা পণ করিয়া বসিয়া আছে।"[৪২] প্রেমে ভালোবাসায়, বিশ্বাসে, ভক্তিতে তার আত্মনিবেদন শচীনের কাছে। শচীনের প্রত্যাখ্যাত পদঘাতকে সে তার 'গোপন ঐশ্বর্য', 'পরশমণি' বলে ভেবেছে। আবার দামিনীর প্রেমে শচীনকেও প্রকম্পিত করেছে। "জপে, তপে, অর্চনায় আলোচনায় বাহিরের দিকে শচীনের কামাই নাই, কিন্তুচোখে দেখিলে বোঝা যায়, ভিতরে ভিতরে তার পা টলিতেছে।"[৪৩] "দামিনীকে সে তাদের দলে যখন আহবান করেছে, তখন থেকেই তার অর্ন্তদ্বন্দ্ব শুরু। এ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে সে, দামিনীকে সবিনয় অনুরোধ করেছে- "তুমি আমাকে দয়া কর তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।"[৪৪] অন্তর্দ্বন্দ্বের অনিবার্য চাপে শচীন-দামিনী উভয়েই হয়েছে ক্ষরিত, ক্ষয়িত। শচীনের অনুরোধে শ্রীবিলাসকে বিয়ে করেছে সে, কিন্তু তার প্রেম ছিল শচীনেরই সমর্পিত। এর চেয়েও বাস্তবধর্মী করুণ চিত্র পাই এই উপন্যাসেরই অন্য প্রান্তে- গুরুর কাছে সম্পত্তিসহ দামিনীকে দান, দামিনীর অলংকার চুরি প্রভৃতি ঘটনায়। পুরুষ যে নারীর প্রতি কতটা অমানবিক, নির্মম, পৈশাচিক ব্যবহার করতে পারে দামিনীর প্রতি স্বামীর কার্যকলাপ, ননীবালার ঘটনা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

'ঘরে বাইরে'- উপন্যাসে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তৃতীয় পুরুষের আগমন দুজনের নৈকট্য সংকটাপন্ন করেছে নিখিলেশ তার ভাবাদর্শ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ স্ত্রী বিমলার ওপর আরোপ করতে গিয়ে তাঁর অন্তর থেকে ছিটকে পড়েছে। আর সন্দীপ এসে আশ্রয় নিয়েছে সেখানে। কিন্তু স্বদেশ ভক্তির মুখোশে বিমলার প্রতি তার আকর্ষণ, অর্থলোলূপতা ক্রমশ তাকে প্রতারক হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। ফলে তাকেও দূরে সরতে হয়েছে। আর উভয় পুরুষের সাহচর্য বঞ্চিত বিমলাকে হতে হয়েছে দীর্ণ, বিবর্ণ, ক্ষত-বিক্ষত। শেষে অমূল্যকে আশ্রয় করে তাকে স্নেহময়ী, অবিচল হতে দেখলেও আমাদের মন ভরে না। কারণ গল্পে- নির্লিপ্ত ভাবাদর্শের ফাঁকি নিখিলেশ-বিমলা-সন্দীপ এ তিন ব্যক্তিকে শূন্যতার মধ্যে নিয়ে গেছে। সবচেয়ে কাছের মানুষ হয়েও তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে অনেকখানি বেশি দূরে ।

'আজ সন্দেহ হচ্ছে আমার মধ্যে একটা অত্যাচার ছিলো। বিমলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটিকে একটা সুকঠিন ভালোর ছাচে নিখুঁত করে ঢালাই করবো আমার ইচ্ছার ভিতরে এই একটা জবরদস্তি আছে। কিন্তু মানুষের জীবনটাতো ছাচে ঢালবার নয়। আর ভালোকে জড়বস্তু মনে করে গড়ে তুলতে গেলেই

Dhaka University Institutional Repository

মরে গিয়ে সে তার ভয়ানক শোধ নেয়। 'এই জুলুমের জন্যেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তফাৎ হয়ে গেছি তা জানতেই পারিনি। বিমল নিজে যা হতে পারতো তা আমার চাপে ফুটে উঠতে পারেনি বলেই নীচের স্তর থেকে রুদ্ধজীবনের ঘর্ষণে বাঁধ ক্ষইয়ে ফেলছে।'[৪৫]

'শেষের কবিতা'-তেও অমিত-লাবণ্য'র প্রেম দুজনকে আশ্রয় করে স্ফুরিত কিন্তু দুজনের বন্ধুত্বকে তারা দাম্পত্যের বন্ধনে না বেঁধে উন্মুক্ত অসীম করতে চেয়েছে। দুজনেই তাদের পারস্পরিক প্রেমকে তুচ্ছ করে দেখতে পারেনি। বরং তাদের জীবনের প্রয়োজনে জীবনসঙ্গী হিসেবে অন্যকে গ্রহণ করেও প্রেমকে স্বীকৃতি দিয়েছে অকুণ্ঠিত চিত্তে। একজন উড়ার আকাশ এবং মন নিয়ে সাতাঁর দিবার পুকুর ভেবে তৃপ্ত, অন্যজন ছায়া থেকে সত্য হয়ে উঠায় । তাই যোগমায়া যখন লাবণ্যকে বলে, আজ আমার লোভ হচ্ছে কোনকালে তোমাদের দু'জনের দেখা না হলেই ভালো হতো'। তখন লাবণ্য তা মেনে নিতে পারেনি। যোগমায়ার কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করছে সে-'না না তা বলোনা। যা হয়েছে তা ছাড়া আর কিছু যে হতে পারতো এ আমি মনেও করতে পারিনে। এক সময়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি নিতান্তই শুকনো-কেবলই বই পড়াবো, আর পাস করবো, এমনি করে আমার জীবন কাটবে। আজ হঠাৎ দেখলেম আমিও ভালোবাসতে পারি। আমার জীবনে এমন অসম্ভব যে সম্ভব হোল এই আমার ঢের হয়েছে, মনে হয় এতদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছি। এর চেয়ে আর কি চাই।' [৪৬] অমিতও কেটিকে গ্রহণ করেছে লাবণ্যকে স্বীকার করে নিয়েই-

"আমি সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ, আজ আমি পেয়েছি আমর ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইলো।'[৪৭]

কেবল তাই নয় শোভনলালকে গ্রহণ করে লাবণ্য যেমন অমিতকে তার স্বস্থান থেকে বিচ্যুত করেনি, অমিতেরও কেতকীকে বিয়ে করতে হয়েছে সত্য, তার আবেগ, সংরাগের স্বীকৃতি তাকে দিতে হয়েছে বটে, কিন্তু লাবণ্যকে তার পূর্ণ গৌরব ও সম্মান দিতে কার্পণ্য করেনি।

আমরা দেখি যে, 'দাম্পত্য পূর্ব- প্রেম' এখানে কারো দাম্পত্য -জীবনেই বিরোপ প্রভাব ফেলেনি বা কোনোরকম টানা-পোড়েন, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি করেনি। কিন্তু কোনো পূর্ব প্রেম না থাকলেও দাম্পত্য জীবনে চরমভাবে অসুখী থেকেছে 'যোগাযোগ'-উপন্যাসের 'রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড' বিপ্রদাসের অতি আদরের ছোট বোন কুমু। বিপ্রদাসকে উদ্দেশ্য করে সে বলেছে-

"...আমাকে ওরা ইচ্ছে করে দুঃখ দিয়েছে তা মনে করোনা, আমাকে ওরা সুখ দিতে পারেনা, আমি এমনি করেই তৈরি, আমিও তো পারবোনা ওদের সুখী করতে, সমাজের কাছ থেকে অপরাদ সমস্ত লাঞ্চনা আমি একলা মেনে নেবো। ওদের গাঁয়ে কোনো কলঙ্ক লাগবেনা। কিন্তু একদিন, একদিন ওদেরকে মুক্তি দেবো, আমিও মুক্তি নেবো ; চলে আসবোই এ- তুমি দেখে নিও । মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারবোনা। আমি ওদের বড়ো বউ, কিন্তু তার কি কোনো মানে আছে, যদি আমি কুমু না

Dhaka University Institutional Repository

হই? ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে দিয়ে যাবো, দাদা'এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যও খোয়ানো যায় না। মানুষ যখন মুক্তি চায়, তখন কিছুতেই কি তাকে ঠেকাতে পারে ? আমি তোমারই বোন দাদা'- আমি মুক্তি চাই। মুক্তি! "[৪৮]

এরকম অসুখী দাম্পত্য জীবন থেকে মুক্তির আকুতি রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখাতেই আমরা পেয়েছি। মধুসুদন-কুমুদিনীর প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্য, রুচিগত পার্থক্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরোধ দাম্পত্য জীবনে দুজনকে ক্রমশ অসুখী করেছে। এবং দাসী শ্যামার উপস্থিতি তা আরো বাড়িয়ে তুলেছে।
'*দুইবোন*' ও '*মালঞ্চ*' -উপন্যাসেও আমরা দেখি যে- নর-নরীর ত্রিভুজ প্রেম জীবনকে শুষ্ক, বিপর্যস্ত করে তুলেছে। দু'টি গল্পেই স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতা, পঙ্গুতা- স্বামীকে উদাসীন ও সংসারবিমুখ করেছে। স্ত্রীর অসহায়ত্বের সুযোগে স্বামী অন্য নারীর প্রতি হয়েছে আসক্ত। সেক্ষেত্রে, বলা যায়, এক নারী-আরেক নারীর দাম্পত্য জীবনে ভাঙ্গন ধরিয়েছে, পুরুষকেও করেছে বিপথগামী। এ কথা, *দুইবোন*-এর শর্মিলা-শশাঙ্ক -উর্মিলার ক্ষেত্রে যেমন, '*মালঞ্চ*'র নীরজা-আদিত্য-সরলার জীবনেও তেমনি সত্য।
-এভাবে কেবল উপন্যাসে নয়; নাটক, কবিতা,সঙ্গীত ইত্যাদিতেও রবীন্দ্রনাথ নর-নারীর চিরন্তন প্রেম-ভালোবাসা, মিলন- বিরহ, পাওয়া-নাপাওয়া'র টানা-পোড়নে তাদের দাম্পত্য জীবনের নানা অসংগতি সমস্যা-জটিলতা বিভিন্ন প্রসঙ্গ-অনুসঙ্গের সংলগ্ন করে তুলে ধরেছেন। আমরা তাঁর '*রাজা ও রাণী*' (১৮৮৯) নাটকে - রাজা বিক্রমদেব -এর কর্তব্যহীনতা দুর্বল মোহ ভঙ্গ করে তাঁর প্রতি আনুগত্য রেখেই রানী সুমিত্রাকে চলে যেতে দেখি- 'তোমারে যে ছেড়ে যাই, সে তোমারি প্রেমে'। এর আগে "মায়ার খেলা' (১৮৮৮)-তেও দেখেছি এর অনুবর্তন-

"এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মিলেনা
শুধু সুখ চলে যায়।
এমনি মায়ায় ছলনা।
এরা ভুলে যায় কারে ছেড়ে কারে চায়।
তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ।
তাই মান অভিমান
তাই এত হায় হায়।"[৪৯]

নারী-পুরুষে প্রেম-ভালবাসা, দাম্পত্য-জীবন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায়, গানে, নাটক- উপন্যাসে অবয়বে মাখালেও রসবচেয়ে উজ্জ্বলতর করে তুলে ধরেছেন ছোটগল্পে। বাংলা ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণ প্রবেশ 'ভিখারিনী' গল্প লিখে, ১২৮৪ বঙ্গাব্দে ভারতী

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকায়। অপরিণত রচনা। ছোট আকারের এই গল্পে-নায়িকা কমল, নায়ক অমরসিংহ, প্রতিনায়ক মোহন কারো মধ্যেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবার কোনো কারণ নেই, নেই ভাগ্যের মারের কাছে ব্যক্তিগত কোনো যুক্তিও। এটি গল্পরচনার ইতিহাসের দিক থেকে সামান্য মূল্য পেলে পেতে পারে, তার বেশি নয়। কেননা অপরিণত রোমান্টিক কাব্যের তুলনায় গদ্যের জগতে এই লেখার কৃত্রিমতা আরও ব্যাপক। এর এক যুগের বেশি সময় পরে তিনি লিখেছেন- 'ঘাটের কথা' ও 'রাজ পথের কথা'-গল্প দুটি। তাতেও আমরা ভবিষ্যতের এতো বড় মাপের গল্পকার হয়ে উঠার পূর্বাভাস পাই না । 'ঘাটের কথা'-য় গঙ্গার ভাঙা ঘাট কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তার বিচিত্র স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে একটি গল্প বানানোর চেষ্টা করেছে। কুসুমের শৈশব-যৌবন, বিবাহ- বৈধব্য, শৈশবের মধুময় দিন আর বৈধব্যের একাকীত্ব- যে টুকু ভাঙা ঘাট তার ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পেরেছে কুসুমের জীবনের সেইটুকু অংশই শুধুমাত্র গল্পে রূপলাভ করেছে। গল্পে মধ্যাংশে সন্ন্যাসীর আগমনে কুসুমের কৌতূহল এবং শেষাংশে কুসুমের আত্মহননে কিছু নাটকীয়তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টামাত্র, অন্তরে স্থান করার মত নয়।[৫০]
'রাজ পথের কথা'-তেও রাজপথের মুখ দিয়ে কিছু ভাব-ভাবনা, বাতাসে ভেসে আসা সামান্য ব্যথা, একটু দীর্ঘশ্বাস, মিশিয়ে কবির 'ভাষায় ছবি আঁকার চেষ্টা লক্ষ করি আমরা। নাম না জানা এক বালিকার দুঃখের যে বিবরন থাকলেও তাতে চরিত্রের রূপরেখা বা কাহিনীর অবয়ব নেই। রবীন্দ্রনাথ তখন পর্যন্ত লেখক এক জাতের গদ্যরচনাই করেছেন, যা পদ্যের কাছাকাছি গিয়েছে কিন্তু গল্প হয়ে উঠেনি। কিন্তু ১৮৯১ -এর মে মাসে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সাধনা' পত্রিকায়-তাঁর যে গল্প বের হয়, তাতে-ভাবী এক বড় গল্পকারের আগমণের আগাম সংকেত পেয়ে যাই আমরা । এখানে তিনি পরপর সাতটি গল্প লিখলেন-দেনাপাওনা,পোস্টমাস্টার, গিন্নি, রামকানাইয়ের নিবুদ্ধিতা, ব্যবধান,খাতা এবং তারাপ্রসন্নের কীর্তি । এই সাতটি গল্পের সঙ্গে পূর্ববর্তী তিনটির কোনো যোগ নেই।

'ঘাটের কথা'য় কাহিনীর মধ্যে 'বানিয়ে তোলার' চেষ্টা ছিলো। এই গল্পগুলির প্রধান লক্ষণ' সাবলীলতা এবং স্বাভাবিকতা। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের গঠন রহস্য আয়ত্ত করেই যেনো লিখছেন, কোথা থেকে গল্পের শুরু,আর কোথায় তার শেষ। 'ঘাটের কথা'র শুরু হওয়ার আগে দীর্ঘ বর্ণনা পরিহার করে তিনি এখন স্বল্পপরিসরে , স্বল্পকথায় জীবনের একটি গভীর মুহূর্তকে প্রতিবিম্বিত করতে এবং একটি ব্যঞ্জনাভরা ইঙ্গিতে ঘটনার অতর্কিত অবসানকে কাহিনীর মধ্যে ধরতে শিখেছেন। এই সাতটি গল্প প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ একটার পর একটা গল্প লিখে গেছেন । গল্প মাধ্যমটি যেনো তাঁর কাছে সবচেয়ে আনন্দের বস্তু হয়ে উঠেছিল তখন। তাঁর নিজের কথাতেই আমরা এর প্রমাণ পাই– "আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছুই না করে ছোটো ছোটো গল্প লিখতে বসি তা হরে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হতে পারলে হয়তো পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে

Dhaka University Institutional Repository

ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার চোখের পরে বেড়িয়ে বেড়াবে । আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালা নাম্মী উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণা করা গেছে।" [৫১]

রবীন্দ্রনাথ তার এ কল্পরাজ্যের প্রভাব সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যা করেছেন, শিলাইদহে অবস্থানকালীন সময়ের বিভিন্ন বর্ণনায়। এ' প্রসঙ্গ আমরা এখানে তিনটি বর্ণনা লক্ষ্য করবো।

১.'(শিলাইদহে পদ্মার) বোটে ছিলাম আমি একলা, সঙ্গে ছিল এক বুড়ো মাঝি, আমর মতো চুপচাপ প্রকৃতির, আর ছিল এক চাকর ফটিক তার নাম, সেও স্ফটিকের মতোই নিঃশব্দ। নির্জনে নদীর বুকে দিন বয়ে যেত নদীর ধারারই মতো সহজে। বোট বাঁধা থাকত পদ্মার চরে। সে দিকে ধূধূ করত দিগন্ত পর্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ বালুরাশি, জনহীন, তৃণশস্যহীন। মাঝে-মাঝে জল বেঁধে আছে, সেখানে শীত ঋতুর আমন্ত্রিত জলচর পাখির দল। নদরি ওপারে গাছপারার ঘন ছায়ায় গ্রামের জীবনযাত্রা। মেয়েরা জল নিয়ে যায়, ছেলেরা হলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটে, চাষীরা গোরু মোষ নিয়ে পার হয়ে চলে অন্য তীরের চাষের ক্ষেতে, মহাজনী নৌকা গুণের টানে পার হয়ে গতিতে চলতে থাকে, ডিঙি নৌকা প্যাটকিলে রঙের পাল উড়িয়ে হু হু করে জল চিরে যায়, জেলে নৌকা জল বাচ করতে থাকে, যেন সে কাজ নয়, যেন সে খেলা-এর মধ্যে প্রজাদের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ আমার গোচরে পড়ত তাদের নানাপ্রকার নালিশ নিয়ে, আলোচনা নিয়ে। পোস্টমাস্টার গল্প শুনিয়ে যেত গ্রামের সদ্য ঘটনা এবং তার নিজের সংকট সমস্যা নিয়ে, বোষ্টমী এসে আশ্চর্য লাগিয়ে যেত তার রহস্যময় জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করে। বোট ভাসিয়ে চলে যেতুম পদ্মা থেকে পাবনার কোলের ইছামতীতে, ইছামতী থেকে বাড়ালে, হুড়ো সাগরে চলন বিলে, আত্রাইয়ে, নাগর নদীতে যমুনা পেরিয়ে সাজাদপুরের কাল বেয়ে সাজাদপুরে। দুইধারে কত টিনের-ছাদ-ওয়ালা গঞ্জ, কত মহাজনী নৌকার ভিড়ের কিনারায় হাট, কত ভাঙ্গন ধরা তট, কত বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ছেলেদের দলপতি ব্রাহ্মণ বালক, গোচারণের মাঠে রাখাল ছেলের জটলা, বনঝাউ-আচ্ছন্ন পদ্মাতীরের উচু পাড়ির কোটরে কোটরে গাঙমালিকের উপনিবেশ। আমার '*গল্পগুচ্ছের*' ফসল ফলেছে আমার গ্রাম- গ্রামান্তরের পথে-ফেরা এই বিচিত্র অবিজ্ঞতার ভূমিকায়।"[৫২]

২. "অল্প বয়সে বাংলাদেশের পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে যখন আমার চোখে চোখে পরিচয় হয়েছিল তখন প্রতিদিন আমর মনে যে আনন্দের ধারা উদ্বেলিত হয়েছিল তাই সহজে প্রবাহিত হয়েছিল ঐ নিরলংকৃত সরল গল্পগুলির ভিতর দিয়ে। আমর নিজের বিশ্বাস এই আনন্দ বিস্মিত দৃষ্টির ভিতর দিয়ে বাংলাদেশকে দেখা আমাদের সাহিত্যের আর কোথাও নেই।"[৫৩]

Dhaka University Institutional Repository

৩. "Mr. Sudarshan: Can you kindly tell us something of the background of your short stories and they originated? The Poet: It was when I was quite young that I began to write short stories. Being a landlord I had to go to villages and thus I came in touch with the village people and their simple modes of life. I enjoyed the surrounding scenery and the beauty of rural Bengal. The river system of Bengal the best part of this province fascinated me and I used to be quite familiar with those rivers. I got glimpses in to the life of the people, which appealed to me very much indeed. At first I was quite unfamiliar with the village life as I was born and brought up in Calcutta and so there was an element of mystery for me. My whole heart went out to quite another world so very different form that of Calcutta. My earliar stories have this background and they describe this contact of mine with the village people. They have the freshness of youth. Before I had written these short stories there was not anything of that type in Bengali literature.' [৫৪]

পদ্মা- তীরবর্তী প্রকৃতি মানব মনে তথা মানব জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করে, তা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর সংবেদনশীল অন্তদৃষ্টি দিয়ে। '*গল্পগুচ্ছে*'র প্রথম পর্বের গল্পগুলোতে তার দৃষ্টান্ত মিলবে বিপুল পরিমাণে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেধা, মনন আর বিচক্ষণতা দিয়ে এদেশের নারী পুরুষের মনের প্রকৃতি, গতি, স্বভাবটিকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন অত্যন্ত নির্ভুলভাবে। সে কারণে '*গল্পগুচ্ছে*' গ্রামীণ পরিসরে কিংবা শাহরিক পরিবৃত্তে নর- নারীর পারস্পরিক সম্পর্কে দৈনন্দিন জীবন-প্রণালীর চিত্রটি এত সত্যময়,এত বাস্তব হয়ে উঠতে পেরেছে। কেবল তাই নয়, সূক্ষ্মদর্শী প্রজ্ঞা এবং আশ্চর্য দূরদৃষ্টিময় দক্ষতায় তিনি ভবিষ্যতের নারী- পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কে চিত্রটিও অত্যন্ত নিপুণ তুলিতে এঁকেছেন সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে (১৯১৪) বসেই। সে কারণেই চারুলতা (১৯০১), মৃণাল (১৯১৪), কল্যাণী (১৯১৪), অনিলা (১৯১৭), অচিরা (১৯৩৯), চরিত্রগুলো আজও অনেক আধুনিক। এমনকি নন্দকিশোর-সোহিনীকেও (১৯৪০) কর্মে চিন্তায়, ব্যক্তিত্বময়তায় এখনও সময়ের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রগামী বলে মনে হয়েছে আমাদের।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে নারী- পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের এমন বিশ্লেষণ, এমন জীবন ঘনিষ্ঠতা, ব্যক্তিত্বময়তা, সচেতনতা বাংলা সাহিত্যে ছিল অনুপস্থিত। এ ভাবনাটিকে রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা না করে বরং তাকে সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। তবে বিষয়টি রবীন্দ্র-মননে সচেতনভাবে আরোপিত নয়। পদ্মাতীরবর্তী পরিবেশ প্রকৃতির নির্জনতায় সাধারণ মানুষের সারল্য- কৌটিল্যে তাঁর সংবেদনশীল

Dhaka University Institutional Repository

কবি মনের উচ্ছ্বসিত আবেগ পরম সৃষ্টিশীলতায় যেন বাঁধ ভেঙ্গে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে তাঁর কবিমনের গীতধর্মীতাই তাঁকে পথ দেখিয়েছে, নতুন সৃষ্টির আনন্দে উদ্বুদ্ধ করেছে। মানুষের আত্মার যত বিচিত্রভাব, অনুভূতি আমাদের অন্তরে বিচিত্র রূপে ও রসে, বর্ণে ও গন্ধে নন্দিত যতো কিছু প্রকাশের কোন পথ পেতো না; এবং যার স্বরূপ কেউ জা তো না, এমনকি কেউ জানবার আগ্রহও দেখাতো না। জীবনের সেইসব ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনা সুখ-দুঃখ নিয়ে প্রথম সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের বর্ণময় অভিযাত্রা তাঁর। নারী- পুরুষের মিলন, বিরহ, নিঃসঙ্গতা, স্বকীয়তা চিত্রায়নে যে মৌল গুনটি রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছকে অনন্য করেছে তা হলো রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভা। এ কারণেই আমরা রবীন্দ্রনাথের দুই সত্তার সামঞ্জস্যের মধ্যে তাঁর কথা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ অনুসন্ধান করে থাকি। যেখানে একটা অন্যটাকে ছাপিয়ে ওঠেনি। কোথায় কবিত্বের দিকটা গল্পের সঙ্গে মিলে-মিশে আছে যে কোনোটাকে আলাদা করা যায় না। তাঁর *'গোরা' 'চতুরঙ্গ' 'যোগাযোগ'* এই জাতীয় রচনা। কিন্তু এই সংগতিসাধনের ক্ষেত্রে সবার আগে দৃষ্টান্তরূপে আসে '*গল্পগুচ্ছ*'র নাম। কবিত্ব যেনো '*গল্পগুচ্ছে*'র মূল চালিকাশক্তি।

গল্পগুচ্ছের তিনটি পর্বের চরিত্র লক্ষ করলে দেখা যাবে তারা নানাভাবে সময়শাসিত। সময় এবং সমাজ তাদের বিভিন্ন দিক থেকে প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্র- প্রতিভা এ ক্ষেত্রে সময়কে অতিক্রম করে গেছে। গল্পগুচ্ছের চরিত্র- চিন্তায় তাঁর বোধ, প্রজ্ঞা, মেধা সতত রূপান্তরশীল। ফলে তা হয়েছে রূপান্তরিত, হয়েছে স্বাধীনচেতা নানা বৈচিত্রে বৈচিত্রময়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়-বাংলা ছোটগল্পের প্রাক রবীন্দ্র যুগ(প্রবন্ধ), *ছোটগল্পের চার দিগন্ত*, সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় ও সৌম্য চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত,বামা পুস্তকালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ , জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা ,পৃষ্ঠা-১।

২. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা-১।

৩. শ্রী ভূদেব চৌধুরী সম্পাদিত- *বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার* ,মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম প্রকাশ (নতুন সংস্করণ)২০০৩,কলকাতা-পৃষ্ঠা-৫৩

৪. পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-মধুমতী (গল্প), শ্রী ভূদেব চৌধুরী সম্পাদিত- *বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার* ,মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিমিটেড, পঞ্চম প্রকাশ (নতুন সংস্করণ)২০০৩,কলকাতা-পৃ-৫২

৫. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা - ৫৩

৬. *ছোটগল্পের চার দিগন্ত* ঃ সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় ও সৌম্য চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত,বামা পুস্তকালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ , জানুয়ারি ২০০৫,কলকাতা ,পৃষ্ঠা-১।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *'সঞ্জীবচন্দ্র' আধুনিক সাহিত্য*।

৮. শ্রী ভূদেব চৌধুরী সম্পাদিত- *বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার* ,মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম প্রকাশ (নতুন সংস্করণ)২০০৩,কলকাতা-পৃষ্ঠা-৭২

৯. অচিন্ত্য বিশ্বাস- *'ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়'* চঞ্চলার গাই গরু (প্রবন্ধ) ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়- বাংলা ছোটগল্প সমীক্ষা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, শুভমহালয়া,১৪১০, করকাতা, পৃষ্ঠা-২।

১০.ড.হীরেন চট্টোপাধ্যায়- *বাংলা ছোট গল্প সমীক্ষা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,১৪১০, কলকাতা, পৃ-১০৯।

১১. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা -১০৯।

১২. অচিন্ত্য বিশ্বাস- 'ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় চঞ্চলার গাই গরু (প্রবন্ধ) ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়- *বাংলা ছোটগল্প সমীক্ষা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, শুভমহালয়া,১৪১০, করকাতা, পৃষ্ঠা-১।

১৩.সোহারাব হোসেন- ছোটগল্পকার প্রভাত কুমারঃ শিল্প স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য(প্রবন্ধ),*ছোঠ গল্প পরিক্রমা (প্রথম খণ্ড)* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা পুস্তক মেলা ২০০৫, কলকাতা-পৃষ্ঠা-৬০

১৪. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ঃ রসময়ীর রসিকতা, সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় ও সৌম্য চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত- *ছোট গল্পের চার দিগন্ত*, বামা পুস্তকালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৫,কলকাতা ,পৃষ্ঠা-৫৬।

১৫. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা -৫৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা -৫৭ ।

১৭. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা -৫৮ ।

১৮. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা -৫৮ ।

১৯. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা ৫৮ ।

২০.প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ঃ রসময়ীর রসিকতা, সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় ও সৌম্য চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত- *ছোট গল্পের চার দিগন্ত*, বামা পুস্তকালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ , জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা ,পৃষ্ঠা-৫৯-৬০।

২১. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা -৬৪ ।

২২. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা -৬৫।

২৩. সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়ঃ রসময়ী ও ক্ষেত্রমোহনের দাম্পত্য জীবন (প্রবন্ধ), সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় ও সৌম্য চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত- *ছোট গল্পের চার দিগন্ত*, বামা পুস্তকালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা ,পৃষ্ঠা-১০৬।

২৪.সোহারাব হোসেন- *ছোট গল্প পরিক্রমা (প্রথম খণ্ড)* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা পুস্তক মেলা ২০০৫, কলকাতা-পৃষ্ঠা-১০৭

২৫. ড. শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- *বাংলা উপন্যাসের ধারা*, পৃষ্ঠা-২৮৩।

২৬. ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-*বাংলার সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, পৃষ্ঠা-৫৬২-৫৬৩।

২৭. শ্রী ভূদেব চৌধুরী সম্পাদিত- *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম প্রকাশ (নতুন সংস্করণ)২০০৩,কলকাতা-পৃষ্ঠা-৭১।

২৮.স্বর্ণকুমারী দেবীঃ কুমার ভীমসিংহ, শ্রী ভূদেব চৌধুরী সম্পাদিত- *বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার* , মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম প্রকাশ (নতুন সংস্করণ)২০০৩, কলকাতা-পৃষ্ঠা-৭১।

২৯. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা -৭১।

৩০. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা -৭১।

৩১. শিশিরকুমার দাশ- *বাংলা ছোট গল্প*(১৮৭৩-১৯২৩), দেজ পাবলিশিং ॥ চতুর্থ সংস্বকরণঃ ফেব্রুয়ারি ২০০২, মাঘ ১৪০৮,কলকাতা পৃষ্ঠা-৭২।

৩২.স্বর্ণকুমারী দেবী:মিউটিনি, *সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় ও সৌম্য চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত- ছোটগল্পের চার দিগন্ত*, বামা পুস্তকালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ , জানুয়ারি ২০০৫,কলকাতা ,পৃষ্ঠা-৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঞ্চয়িতা*, কবিতা -বর্ষা যাপন

৩৪. নজরুল কবির- *রবীন্দ্র ছায়া বৃক্ষের ছায়াতলে (প্রবন্ধ)*,
শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র, লিড ফেয়ার, বৈশাখ, ২০০৬, ঢাকা ।

৩৫. রবীন্দ্রনাথ- *ছিন্নপত্রঃ* পত্র সংখ্যা-৫

৩৬. শ্রী বুদ্ধদেব বসুর সহিত আলোচনার অনুলিপি-দ্র. *রবীন্দ্র রচনাবলী*, বিশ্ব ভারতী
১৪শ খণ্ড 'গ্রন্থপরিচয়

৩৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত- *'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'* ।
উদ্ধৃতি- শ্রী ভূদেব চৌধুরী- *বাংলা সাহিত্যে ও ছোটগল্প ও গল্পকার*, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম প্রকাশ, নতুন সংস্করণঃ ২০০৩, পৃষ্ঠা-৭৪

৩৮. জীবেন্দ্র সিংহ রায়- *সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ (দ্বিতীয় পর্ব)*
কলিকাতা-১৯৬১, পৃস্ঠা-৩২৫-৩২৬

৩৯.ডঃ নীহাররঞ্জন রায়-*রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, *রবীন্দ্র- সাহিত্যের ভূমিকা*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ ১৯৪১, কলিকাতা,পৃষ্ঠা-৩৪৭

৪০. নজরুল কবির- *রবীন্দ্র ছায়া বৃক্ষের ছায়াতলে*, শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র, লিড ফেয়ার,
বৈশাখ, ২০০৬, ঢাকা ।

৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *চোখের বালি*, *রবীন্দ্র- রচনাবলী*, দ্বিতীয় খন্ড,১২৫-তম রবীন্দ্র-জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫০৯।

৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *'চতুরঙ্গ'* রবীন্দ্র- রচনাবলী, চতুর্থখণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৪০।

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫০।

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৬২।

৪৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *'ঘরে-বাইরে'* রবীন্দ্র- রচনাবলী, চতুর্থখণ্ড, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং-পৃষ্ঠা-৫৯০।

৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- 'শেষের কবিতা' রবীন্দ্র- রচনাবলী, পঞ্চমখণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৯১।

৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *'শেষের কবিতা'* রবীন্দ্র- রচনাবলী, পঞ্চমখণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫২২।

৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – *'যোগাযোগ'* (উপন্যাস)

৪৯.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-*মায়ার খেলা*, *গীতবিতান*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৬, পৃষ্ঠা -৬৮২।

৫০. শ্রী ভূদেব চৌধুরী- *বাংলা সাহিত্যে ও ছোটগল্প ও গল্পকার*, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম প্রকাশ, নতুন সংস্করণঃ ২০০৩, পৃষ্ঠা-২।

Dhaka University Institutional Repository

৫১.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -*ছিন্নপত্র*

৫২. রবীন্দ্রনাথের উক্তি, প্রভাত- রবি। রবিচ্ছবি

৫৩. রবীন্দ্রনাথের *চিঠিপত্র*- ৯

৫৪. Forward, 23 February, 1936, (শিশিরকুমার দাশ- *বাংলা ছোটগল্প*(১৮৭৩-১৯২৩), দে'জ পাবলিশিং ॥ চতুর্থ সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০০২, মাঘ ১৪০৮, কলকাতা পৃষ্ঠা-৮১)।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র ছোটগল্পে বিধৃত দাম্পত্য প্রেমচিত্র ও জীবনরূপ

নরের বিপরীতে নারী সংসারনদীর দুই বিপরীত তীর। আনন্দের মহাভোজে এরা দুজন একে অপরের নিকট দায়বদ্ধ হয়। দুটি ভিন্ন পরিবারের, ভিন্ন পরিবেশের, ভিন্ন মানসিকতার নারী পুরুষের সমন্বয়ে তৈরি হয় একটি পরিবার। স্বামী-স্ত্রী ছাড়াও পরিবারে শ্বশুর-শাশুড়ি ননদ দেবরসহ অনেকে মিলে তবেই পরিবার। বাঙালি পরিবারের এটাই বৈশিষ্ট্য। পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা মত, রুচি থাকে, ফলে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটা খুবই স্বাভাবিক। সংসারে যেমন মায়া-মমতা,প্রেম-ভালোবাসা আছে, তেমনি এর বিপরীত দিকটিও আমাদের স্বীকার করে নিতে হয়। তা না পারলেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেখা দেয় দাম্পত্য অসুখ। সুখের অমিয় ধারায় সিক্ত হয়ে তাঁরা স্বচ্ছতায় স্নিগ্ধতায় মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু তা না পারলেই বিপত্তি লাগে, দূরত্ব বাড়ে।

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য-সংসারে সমস্যা সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা বড় প্রভাবক হল বিশ্বাস। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বামী-স্ত্রীর ভুল বোঝা-বুঝি এবং দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি হয় পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসবোধের অভাব থেকে। তবে এই সব ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের বহু গল্পে এই বিষয়টির রূপায়ণ ঘটেছে।

গল্পগুচ্ছের নর-নারীর এই প্রেম-ভালোবাসা,বিবাহ-দাম্পত্যজীবন সম্পর্কের প্রতিদিনকার অত্যন্ত চেনাজানা নানা ঘটনা সহজ ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। সেই গল্পগুলো থেকে বিশেষ কয়েকটি গল্প নিয়ে এই অধ্যায়ে উল্লিখিত বিষয়টির আলোচনা করা যেতে পারে। দাম্পত্য প্রেমসমৃদ্ধ গল্পের মধ্যে আমরা- 'মুক্তির উপায়' (১২৯৮),ত্যাগ (১২৯৮)'একরাত্রি' (১২৯৯),'মহামায়া' (১২৯৯), 'মধ্যবর্তিনী'(১৩০০), 'সমাপ্তি'(১৩০০),প্রতিহিংসা(১৩০০),'আপদ'(১৩০১),দৃষ্টিদান ১৩০৫),'মাল্যদান'(১৩০৯),'দর্পহরণ' (১৩০৯),'হৈমন্তী'(১৩২১),'অপরিচিতা' (১৩২১),'শেষের রাত্রি', 'তপস্বিনী' প্রভৃতির নাম করতে পারি। এগুলোতে দাম্পত্য সংসার সম্পর্কে খোঁজ -খবর করে আমরা দেখেছি- স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি পুরুষ চরিত্রগুলো । ব্যর্থতা অযোগ্যতা অত্যন্ত অসহায় ও দুর্বল করে দিয়েছে তাদেরকে। এবং তাঁরা আস্থাহীন হয়ে সংকটময় পরিস্থিতিতে আবেগতাড়িত হয়েছে।
'একরাত্রি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'নষ্টনীড়',হালদারগোষ্ঠী প্রভৃতি গল্পে আমরা এর সত্যতা পেয়েছি। অন্য দিকে নারীর মধ্যে স্বাবলম্বী হবার দৃপ্ত চেতনাও লক্ষ করা গেছে বহু গল্পে। এ প্রসঙ্গে আমরা 'মানভঞ্জন', অপরিচিতা, ল্যাবরেটরি,প্রভৃতির নাম করতে পারি। তবে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক রূপায়ণের ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রভাবনাটি ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে নারীর আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির মধ্যদিয়ে। নারী চরিত্রগুলোর সরব ও নিরব বিদ্রোহের পথ ধরে। 'মহামায়া, মধ্যবর্তিনী,শাস্তি, হৈমন্তী, স্ত্রীর পত্র, পয়লা নম্বর প্রভৃতিকে এর দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করতে পারি আমরা। এসব গল্পের কোন কোনটিতে পুরুষের দাম্ভিকতার কাছে নতি স্বীকার না করে নারী জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে এবং সেই বিসর্জনের মধ্য দিয়ে সমাজ ও মানুষকে নাড়া দিতে চেয়েছে। সুন্দরের জন্য অসুন্দর পথে পা বাড়িয়েছে, নিয়মের জন্য নিয়ম ভেঙেছে।

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির উপস্থিতিও অনেক সময় তাদের মধুর সম্পর্ক বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। 'আপদ, ও 'দিদি' গল্পে আমরা এর উপযুক্ত প্রমাণ পেয়েছি। দাম্পত্য সংসারে নানা সমস্যার মধ্যে অন্যতম একটা সমস্যা হিসেবে আমরা পেয়েছি 'সন্তানহীনতা' বা সন্তান না থাকার সমস্যা । এ ধরণের সমস্যা সমাধানকল্পে স্বামী স্বেচ্ছায় অথবা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রচণ্ড ভালোবাসা থেকে সৃষ্ট অনুরোধে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের ফলে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব বেড়েছে; দাম্পত্য সংসারে শোকের ছায়া এসে পড়েছে।

'নিশীতে' গল্পে আমরা এ বিষয়টি লক্ষ করেছি। যদিও স্ত্রীর অসুস্থতা, অক্ষমতা স্বামীকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহনে প্রেরণা দিয়েছিল, তবু স্বামীর ব্যক্তিত্বহীনতার অভাবহেতু ছলনা ও মিথ্যাচার অসুস্থ স্ত্রীর প্রতি ঔদাসীন্য তাকে অপরাধী করে তুলেছে। এর আর একটি অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেয়েছি আমরা 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে। স্ত্রীর জীবদ্দশাতেই দ্বিতীয় স্ত্রীগ্রহণ কীভাবে প্রণয়াসক্ত ও দাম্পত্য সংসার সুখে বিভোর স্বামী-স্ত্রী উভয়কে নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তারই মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার উজ্জ্বল নিদর্শন এই গল্প। এ ক্ষেত্রে অনেকে নারীর অক্ষমতাকে পুরুষের দ্বিতীয় স্ত্রীগ্রহণে সংগত হয়েছে বলে মনে করে থাকেন কিন্তু এটি নারীর প্রতি পুরুষের অপ্রতিহত মোহের পরিচয় দেয় । স্ত্রী নারীটির কাছে যখন স্বামী পুরুষটির আসল চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে তখনই সে স্ত্রীর অধিকার হতে হয়েছে প্রত্যাখ্যাত। গল্পগুচ্ছের দাম্পত্য-প্রেমের গল্পগুলোতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্টের অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষায়, বয়সে এবং মানসিকতায় অসমতা। এই অসমতার ফলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের হের-ফের হয়েছে, ভারসাম্য রক্ষা হয়নি শেষ পর্যন্ত।

এই অসামঞ্জস্য রবীন্দ্রনাথের গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ করা যায়। এর কারণ তখনকার সময় ও সমাজকে তিনি এড়িয়ে যাননি, যেতে চাননি। সংলগ্ন হয়ে থেকেছেন সেই চিন্তার মধ্যে, তাই তাঁর লেখার মধ্যে সেগুলো দ্রবীভূত হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা, বয়স ও রুচিগত দূরত্ব বজায় রেখে উনিশ শতকের অধিকাংশ নারীদের দাম্পত্য-জীবনের সূচনা। এর আর একটি কারণ। কনকচাঁপা-শৈলবালা-গিরিবালা (মেঘ ও রৌদ্র) প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য আমরা সেই বিকাশ লক্ষ করেছি। শুধু উনিশ শতক নয়, পরবর্তীতে বিশ শতকের প্রথম দশকের চারুলতা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের মনি ও ষোড়শীও এ

Dhaka University Institutional Repository

অসমতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। আমরা দেখি যে, বিয়ে বিষয়টি বুঝবার বয়স হবার আগেই বিয়ে হয়েছে এবং ছাব্বিশ বছরের রূপসী রমণীর সময় যে বিধবা। অসম বিয়ের ফলেই সে বিধবা এবং জীবনের সর্বোত্তম বয়সের সমস্ত চাওয়া থেকে বঞ্চিত, তাই সে তৃষিত ও অতৃপ্ত। একারণেই ভ্রাতৃ-বন্ধু ডাক্তার শশিশেখরকে ঘিরে তার ভালোবাসা সতেজ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা পূর্ণতা না পেয়ে-তার নিজের কাছে জীবনকে বয়ে বেড়ানো প্রয়োজনের বোঝা বলে মনে হয়েছে। বয়সের এ অসমতা 'নিবারণ ও শৈলবালার' দাম্পত্য জীবন যে কীপ্রকারের অস্থির ও যন্ত্রণাময় হয়েছিল তা আমাদের ভালো করেই নাড়া দিয়েছে। বাল্যবিবাহ শৈলবালার জীবনকে যে কতটা নিষ্ফল ও অসম্পূর্ণ করেছিল তা আমরা একটিমাত্র বাক্যে (সংসারে সমস্ত সোহাগ আদর লইয়া পরম অসুখ ও অসন্তোষে বালিকার ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ ব্যর্থ জীবন অকালে নষ্ট হইয়া গেল) উপলব্ধি হয়েছে। একই কারণে বিশ শতকে এসেও মুক্তি মেলেনি চারুলতার । খবরের কাগজের মস্ত বড় সম্পাদক ভূপতি জগতের সমস্ত খবর রাখলেও যৌবনবতী স্ত্রীর মনের খবর রাখেনি। ফলে স্বামী-স্ত্রী হয়েও পরস্পরের জীবন যেন 'নিঃসম্পর্ক লোকের মত'।'শেষের রাত্রিতে দেখা গেছে এই অসম বিবাহের করুণ পরিণতি। গল্পে একদিকে বালিকা বধু মণির অস্থির চঞ্চলতা, ছেলেমানুষি, সংসারকর্মে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত বেশি বয়েসী যতীন স্ত্রীকে কাছে পেতে ব্যাকুল হয়েছে, দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণায় কাতর হয়েছে। কিন্তু মণির কাছে তাঁর এ ব্যাকুলতা কোনো আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। স্বামী যতীনের অসুস্থতায় সে আরও সংসারবিমুখ ও উদাসীন হয়ে পড়েছে। মুমূর্ষু স্বামীকে রেখে ছোটবোনের অন্নপ্রাশনে যাবার আয়োজন করেছে সে। বয়সের বিস্তর পার্থক্যের কারণে তারা স্বামী-স্ত্রী দুটি তার দুই রকম সুরে বেজেছে। স্বামীর প্রতি প্রেমে আন্তরিকতায় এক ধরণের বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে মণির ভিতর। ফলে মণি চিরকাল স্বামীর 'ঘরের বাইরে' দাঁড়িয়ে রইল, কিছুতেই ঢুকতে পারল না,আর যতীন মাসির মিথ্যা সান্ত্বনার মধ্যে থাকতে থাকতে এক সময় স্ত্রীর সমস্ত অবহেলার বদলে বৈধব্যের বসন উপহার রেখে গিয়েছে।

নারীর মানসিক প্রতিবন্ধকতা যে কতটা অশান্তির কারণ হয়েছে দাম্পত্য-সংসারে, তার বাস্তব প্রমাণ 'সুভা' গল্প। বাকহীন মুক বালিকা সুভার বিয়ে তার অসহায় জীবনকে আরও অসহায় করে বিশাল এক অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছি। এরকম ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্যা ও জটিলতা কীভাবে দাম্পত্য সংসারের সমস্ত সুখ নষ্ট করে স্বামী-স্ত্রীকে মেরুদূরত্বে ঠেলে দিয়েছে সে বিষয়ে আলেকপাত করা হয়েছে।

১.মুক্তির উপায়

'মুক্তির উপায়'- রবীন্দ্রনাথের একটি ব্যঙ্গাত্মক গল্প। এতে দাম্পত্য জীবনের একটি সমস্যা হাস্যরসের মাধ্যমে অথচ রুচিশীল ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে । গল্পে ফকিরচাঁদ, মাখনলাল,স্ত্রী-সন্তান ঘটিত দাম্পত্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে রাতের অন্ধকারে সংসার ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রথমজন-

Dhaka University Institutional Repository

অপার্থিব জগত নিয়ে অস্থির- 'পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিবিষ্টমনা অল্প বয়সী হৈমবতীর স্বামী। যে হৈমবতীকে-'অবসর পাইলেই ভাগবত পড়ায়, সন্ধ্যাবেলায় ভগবদ্গীতা শুনায়, এবং তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশে মাঝে মাঝে শারীরিক শাসন করিতেও ত্রুটি করে না।"[১] এবং যে স্বভাবে গুরুগম্ভীর, ঠাণ্ডা জল, হিম, হাস্য-কৌতুক ইত্যাদি সহ্যের একেবারে বাইরের লোক। কিন্তু হৈমবতী তাঁর বিপরীত - সে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়তে চায় এবং স্বামীকে একেবারে দেবজ্ঞানে। "সে একটুখানি হাসিখুশি ভালোবাসে; এবং বিকাশোন্মুখ পুষ্প যেমন বায়ুর আন্দোলন এবং প্রভাতের আলোকের জন্য ব্যাকুল হয়, সেও তেমনি এই নবযৌবনের সময় স্বামীর নিকট হইতে আদর এবং হাস্যামোদ যথাপরিমাণে প্রত্যাশা করিয়া থাকে।"[২] এই বৈপরীত্যের কারণে তাদের দু'জনের দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তিকে আমরা নোঙর করতে দেখি না। তবু স্বামীর অবিশ্রান্ত আদেশ, অনুদেশ, উপদেশ, ধর্মনীতি এবং দণ্ডনীতির দ্বারা অবশেষে হৈমবতীর মুখের হাসি, মনের সুখ, যৌবনের আবেগমথিত করে দুই ছেলে-মেয়ের জন্ম দেয় সে।এবং পিতার তাগিদে কাজের সন্ধান করে, না পেয়ে একদিন গভীর রাতে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। দ্বিতীয়জন--নবগ্রামবাসী জমিদার ষষ্ঠীচরণের ছেলে,"বিবাহের অনতিবিলম্বে সন্তানাদি না হওয়াতে পিতার অনুরোধে এবং নূতনত্বের প্রলোভনে আর-একটি বিবাহ করে।"[৩] বিয়ের পর তার উভয় স্ত্রীর গর্ভে সাতটি কন্যা ও একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। ফলে অর্থের অভাব না থাকলেও সন্তানের ভার, বিশেষ করে দুই স্ত্রীর বিবাদে দাম্পত্য জীবন তাঁর কাছে অসহ্যকর হয়ে উঠলে সে ঘর ছেড়ে পালিয়ে মুক্তির পথ খুঁজে। পরে এদের ঘরে ফেরার বিষয়টি নিয়েই এই গল্পের সবিশেষ কৌতুকতা- 'এইবেলা এখান হইতে এক দৌড় মারি;' "ওরে ও পোড়াকপালে মিন্‌সে, তুই মা বললি কাকে;..ইনি তো পরমহংস নন,পরম বক"[৪]। 'মুক্তির উপায়' গল্পে পারিবারিক জীবনের একটি সমস্যাগত দিক রসস্নিগ্ধ ভাষায় ও ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে। ফকিরচাঁদ নামে এক নিরীহ কিন্তু অত্যন্ত নীতিপরায়ণ বাঙালী সংসারধর্ম পালনে বিরক্ত হয়ে, বলা যায় অসমর্থ হয়ে, সংসার ত্যাগ করে। সন্ন্যাসী অবস্থায় ফকিরের লাঞ্ছনার যে ব্যঙ্গচিত্র গল্পে রূপ পেয়েছে তাতে ব্যঙ্গাত্মক গল্প হিসাবে 'মুক্তির উপায়'অদ্ভুত রসাস্বাদমধুর হয়ে উঠেছে। সন্ন্যাসধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ছিল তার একটা সহজ প্রকাশ আছে এই গল্পে। তবে তা তাঁর পরবর্তীকালের- 'উদ্ধার', 'তপস্বিনী' ইত্যাদি গল্পের মত তীব্র কটাক্ষপূর্ণ নয়।

২. একরাত্রি

'একরাত্রি'(১২৯৯) হিতবাদী-সাধনা পর্বের রোমান্টিক প্রেমের গল্প। এ পর্বে রচিত সোনার তরী'র-মানস সুন্দরী, পরশপাথর, আকাশের চাঁদ প্রভৃতির মূলভাব প্রসঙ্গের ছোঁয়া আছে এ গল্পের অন্তরে ;

Dhaka University Institutional Repository

অথবা এ গল্পের মূল বিষয় বস্তুর সঙ্গে সমস্ত কবিতার। এ গল্প পাঠকালে, লেখকের কথায় মনে হয় মনুষ্যসমাজ একটি জটিল ভ্রমের স্থান। "ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করিতে কাহারও মনে পড়ে না,তাহার পরে বেঠিক সময়ে,বেঠিক বাসনা লইয়া অস্থির হইয়া মরে।"[৫] একরাত্রি, সেই অস্থিরতার কাব্য। সুরবালা, তাঁর স্বামী রামলোচন এবং সুরবালার বাল্যসঙ্গী গল্পকথক এই তিন চরিত্রের গল্পে একটিও সংলাপ নেই। পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন বর্ণনাও অনুপস্থিত। গল্পের পুরো কাহিনী গল্পকথক নায়কের জবানীতে উপস্থাপিত কিন্তু তার নাম জানা যায়নি। তাতে এ লোকটির ব্যক্তি স্বভাবের একটা বর্হিরঙ্গ রূপরেখা ফুটে উঠতে বাধা না হলেও পাঠক সহজেই এই 'আমি'র মধ্যে নিজস্ব ভাব ভাবনার প্রতিফলন অনুভব করে।

গল্পের প্রথমাংশে নায়কের পূর্বকথা, দুটি মাত্র ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদে সুরবালার একত্রে পাঠশালায় গমন, বউ বউ খেলা, এবং অভিভাবকের প্রশ্রয়ে অনুগামিনী সহচরীর প্রতি বালকোচিত প্রভুত্বের কথা-"আমি কেবল জানিতাম,সুরবালা আমারই প্রভুত্ব স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে,এই জন্য সে আমার বিশেষরূপ অবহেলার পাত্র।"[৬] মধ্যমাংশে নাজির সেরেস্তাদার হবার মানসে সুরবালার প্রভাবের গণ্ডী অতিক্রম করে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় পালিয়ে আসা, ম্যাটসীনি গারিবালডি হবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে সুরবালার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব অবহেলা ভরে প্রত্যাখ্যান, পিতার মৃত্যুর পর স্বপ্নের ফানুস চুপসে গেলে বাস্তবের নগ্ন মূর্তির মুখোমুখি আত্মরক্ষার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে মফঃস্বলে মাস্টারি চাকরি গ্রহণ, স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্ববোধ জাগ্রত করার ব্যর্থ চেষ্টা, ইত্যাদি এবং শেষাংশে সুরবালাকে না পাওয়া বা পাওয়া, অস্থিরতা বা স্থিরতা বর্ণিত হয়েছে। গল্পে কথকের সাথে সুরবালার বিয়ে হলে কেমন হতো? আর রামলোচন উকিলের সাথে বিয়ে হয়ে কেমন হয়েছে বা জীবন কেমন চলেছে? এ প্রসঙ্গে একটি অনুচ্ছেদে-ই এই গল্পে দাম্পত্য সম্পর্কের জীবন চিত্র রূপে উপস্থিত। কথকের জবানীতে অনুচ্ছেদটি-

> "তোমার মতো লোক সুরবালার স্বামীটি হইয়া বুড়াবয়স পর্যন্ত বেশ সুখে থাকিতে পারিত; তুমি কিনা হইতে গেলে গারিবাল্‌ডি এবং হইলে শেষে একটি পাড়াগেঁয়ে স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার! আর, রামলোচন রায় উকিল তাহার বিশেষ করিয়া সুরবালারই স্বামী হইবার কোনো জরুরি আবশ্যক ছিল না; বিবাহের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাহার পক্ষে সুরবালাও যেমন ভবশংকরীও তেমন, সেই কিনা কিছুমাত্র না ভাবিয়া চিন্তিয়া বিবাহ করিয়া, সরকারি উকিল হইয়া দিব্য পাঁচ টাকা রোজগার করিতেছে-যেদিন দুধে ধোঁওয়ার গন্ধ হয় সেদিন সুরাবালাকে তিরস্কার করে, যেদিন মন প্রসন্ন থাকে সেদিন সুরবালার জন্য গহনা গড়াইতে দেয় । বেশ মোটাসোটা, চাপকান-

Dhaka University Institutional Repository

পরা, কোনো অসন্তোষ নাই; পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া আকাশের তারার দিকে চাহিয়া কোনো দিন হাহুতাশ করিয়া সন্ধ্যাযাপন করে না।"[৭]

সুরবালা ও রামলোচনের দাম্পত্য সম্পর্কের এই জীবনচিত্রটি একমুখী আনন্দভরা। কেননা রামলোচনের গৃহে সুরবালার স্বতন্ত্র কোনো মূল্য নেই। সে শুধু গৃহিনী। রামলোচনের কাছে সে' যে নেহাৎই গৃহিনী, সে কথা গল্প পাঠকালে আমরা বুঝতে পারি। এছাড়া ঝড় বৃষ্টির মৌসুমে সুরবালাকে একলাবাড়ি, একা ঘরে রেখে, তাকে দেখা শোনার কোনো লোক লস্করের ব্যবস্থা না করে মকদ্দমার কাজে কিছুকালের জন্য রামলোচনের অন্যত্র চলে যাওয়া ও সুরালার প্রতি, স্বামী হিসেবে দায়িত্বে চরম অবহেলা- সুরবালার প্রতি অবহেলা বলেই মনে হয়।

গল্পকথক বাল্যে সুরবালার উপর শাসন ও উপদ্রব করলেও সে সহিষ্ণুভাবে সব শাস্তি বহন করতো । এ অধিকার নারীর উপর পুরুষের সার্বভৌম শাসনের দৃষ্টান্তকে সর্ন্তপণে উন্মোচিত করেছে আমাদের সামনে। গল্পে একটি সামাজিক প্রথার কথা এসেছে। গল্প কথকের বয়স আঠারো হওয়াতে তা অভিভাবকদের মুখে 'বিবাহের বয়স অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে' এই বিষয়টি। সে কারণে এগার বছরের সুরবালার সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয় এবং গল্পকথক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ঐ বয়সেই সুরবালার বিবাহ হয়েছে রামলোচন উকিলের সঙ্গে অর্থাৎ বাল্যবিবাহ বিষয়টি তখন দোষনীয় ছিল না।

মনোবিশ্লেষণে প্রমাণিত যে, বয়সের বিস্তর পার্থক্য থাকলে, দাম্পত্য জীবন বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অসুখী ও শান্তিহীন হয়। সুরবালার ক্ষেত্রেও হয়তো তাই। রামলোচন তাকে প্রসন্ন সময়ে গহনা গড়ানোর বাসনা করলেও তা হয়তো সেইটুকু পূরণ করতে পারেনা। অনেকটা 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুর হাত থেকে তাঁর দাদা বিপ্রদাসের দেয়া নীলার আংটি খুলে নিয়ে তাতে মহামূল্যবান কিছু উপহার দেয়ার মধ্য দিয়ে মধুসূদন হয়তো আনন্দ পায়, কিন্তু কুমোর আনন্দ তাতে একে বারেই হয় না তার মতো।

একরাত্রি, গল্পটি মূলত একটি বিশেষ মুহূর্তকে সজীব ও অনন্ত করে তুলবার অভিপ্রায়। গল্প কথকের কাছে এক রাতের অভিজ্ঞতা সারা জীবনের সজীব সম্পদ হয়ে গেছে। এবং তা তাঁর স্মৃতির মণিকোঠায় অক্ষয় আছে। এখানে তাঁর সমস্ত অপ্রাপ্তি, অতৃপ্তি কেবল তাঁর ব্যক্তিগত হয়ে থাকে নি সারা বিশ্বের বেদনার সঙ্গে লীন হয়ে গেছে।

'পরশপাথর' কবিতার সঙ্গে এ গল্পের মর্মগত একটা মিল লক্ষণীয়। পরশপাথর-এর সন্ন্যাসীর মতো গল্পের নায়কও- "অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন ক্ষণে চক্ষু বুজি/ স্পর্শ লভেছিল যার একপলভর/ বাকি অর্ধ ভগ্নপ্রাণ আবার করিছে দান/ ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ পাথর।"[৮]

Dhaka University Institutional Repository

এ গল্পের নায়কের পক্ষে সুরবালাই পরশপাথর। সুরবালার জন্যই তাঁর ভিতরটা টনটন করে ওঠে। এ যেনো- "অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়সী/মনে আছে কবে কোন ফুল্লযূথীর বনে,
বহু বাল্য কালে দেখা হত দুই জনে/আধো চেনা শোনা? ---
ছিলে খেলার সঙ্গিনী/এখন হয়েছে মোর মর্মের গেহেনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী------/আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছে প্রিয়ে
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।"[৯]

একান্ত গৃহকোণে যে সুরবালাকে সে পায়নি তাকেই কথক পেল বৃহৎ বিশ্বের বিশাল প্রেক্ষাপটে, একটি প্রলয় রাত্রিতে, আত্মিক প্রেমের প্রতিমারূপে। বাঁধের উপর এসে দু'জন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিন্তু কোনো সংলাপ নেই। একটিমাত্র পরম মুহূর্ত লেখক সৃষ্টি করেছেন যে মুহূর্তটি আমরা পাই সেই কালরাত্রির ভয়াল গর্জনের মধ্যে; যে পটভূমিতে- 'সেই লগ্নে দুজন প্রাণীর নিঃশব্দ প্রতীক্ষা যারা- আজ কেউ কারো নয়, অথচ পরস্পরের কী না হইতে পারিত!' নিখিল বিশ্বের যাবতীয় বস্তুনিচয়, মানবীয় প্রেম-প্রীতি, বিরহ মিলন, আনন্দ ও দুঃখ সব কিছুই ক্ষণিকের, সব কিছুই- স্বপ্নের মত, এই সবই মহাজীবনের খণ্ডাংশ। মৃত্যুতে খণ্ড জীবনের পরিসমাপ্তি হলেও তা মহাজীবনেরই অব্যাহত ধারা। রবীন্দ্রনাথ 'একরাত্রি' গল্পে নায়কের মধ্যে সেই চিন্তাকে সঞ্চারিত করছেন। সুরবালা সম্পর্কিত তার অনুভূতি আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

একরাত্রি গল্পের নায়ক তৎকালীন রাজনৈতিক আদর্শের পিছনে ছুটে শেষে ব্যর্থ হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে নিজের মধ্যে। গল্পে তার হতাশ চিত্তের যন্ত্রণাকে বড়ো করে দেখানো যেত। কিন্তু তা করা হয় নি। মূলত একজন ব্যর্থ জাতীয়তাবাদী ভলান্টিয়ার এবং ক্ষুব্ধ সেকেন্ড মাস্টারকে আশ্রয় করে লেখক একটা উপলব্দিকে ব্যক্ত করেছেন- যাকে যুক্তিতে বিচার করা যায়না। তবে তৎকালের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনে এই যুবকের ন্যায় ব্যর্থ হয়ে অনেকেই হতাশ জীবন যাপন করছে।

৩. মহামায়া

মহামায়া (১২৯৯) বিধবা -প্রেম নিয়ে রচিত গল্প। গল্পে একটি সামাজিক প্রথা, কুলীন-অকুলীনের বৈষম্য থাকলেও একটি বিশেষ ঘোমটা'র সংকট এবং মহামায়ার হৃদয়রহস্যই গল্পের প্রাণ। এতে চরিত্রের মুখে স্বল্প সংলাপ-মহামায়ার' ৬টি, রাজীবের' ৭টি, ভবানীচরণের দু'বার দুটি শব্দ, ছাড়া পুরোটাই প্রসঙ্গ কথা ও প্রকৃতি বর্ণনায় উজ্জ্বল। গল্পে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা চোখে পড়ে এবং সেগুলো শব্দ ক্রমানুসারে সাজালে দেখি-

Dhaka University Institutional Repository

"সাক্ষাৎ, প্রস্তাব, প্রত্যাখ্যান, প্রতিশ্রুতি, প্রতীক্ষা, বিয়ে, সহমরণ, প্রতিজ্ঞা, পলায়ন এবং বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী না হয়েও দু'জন নর-নারীর সহাবস্থান ও ঘোমটা সরে যাওয়ায় মুখ দেখার অভিযোগে 'মহামায়ার' গৃহত্যাগ"।

গল্পের প্রধান দুটি চরিত্র রাজীব ও মহামায়া। মহামায়া কুলীন ঘরের কুমারী।"শরৎকালের রৌদ্রের মতো কাঁচা সোনার প্রতিমা....তাহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক।"[১০] আর রাজীব-ভীতু, রেশম কুটিরের এক কর্মচারীর সন্তান, বাবার মৃত্যুর পর সেও সেখানে আশ্রিত কর্মচারী। তাঁর পিসির প্রতিবেশী হিসেবে 'মহামায়া' বাল্যসঙ্গিনী রাজীবের। কিন্তু মহামায়ার প্রবল কুলাভিমান রাজীবকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখে। তাই রাজীব ভাঙ্গা মন্দিরে সাক্ষাৎ করে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করলে, সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। মাথা নেড়ে, বলেছে-'না সে হইতে পারে না।' কারণ রাজীব অকুলীন ব্রাহ্মণ, তাছাড়া, 'ভালোবাসা এক এবং বিবাহ করা আর।' রাজীব আশাহত হয়ে দেশ ছাড়ার কথা বললে মহামায়া 'আচ্ছা' বলে সম্মতি দিয়েছে, বাধা দেয়নি, বরং তার দৃষ্টিভঙ্গিতে 'দুইজনের জীবনের গতি দুই দিকে' চিহ্নিত হয়েছে। যদিও 'রাজীব, তোমার ঘরেই আমি যাইব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো।' বলে মহামায়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবু -এ কথার মধ্যেও মহামায়ার সেই দীপ্ত তেজস্বিতাই প্রকাশ পেয়েছে। দাদার গোয়েন্দাগিরিতে মহামায়ার আত্মমর্যাদায় ঘা লাগলে তাঁর মুখের উপর এই কথাগুলি ছুঁড়ে দিয়েছিল মহামায়া- "তোমার ঘরে আমি যাইব, তোমাকে বিয়ে করব'সে কথা কিন্তু নয়'[১১] কিন্তু রাজীব মহামায়ার প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে" দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খেতে রাজি। 'তবু চিরজীবন অপেক্ষা করিতে ছাড়িবেনা' এখানে আমরা মহামায়ার প্রতি রাজীবের যে টান দেখি, তা তার আত্মার টান, অকৃত্রিম ভালবাসার টান। কিন্তু মহামায়ায় যে প্রেম দেখি, তা তার নারীজীবনের স্বভাব ফসলমাত্র। তাও, তাঁর ব্যক্তিত্ব গৌরব অহমিকার কাফনে মোড়ানো এবং রাজীবের প্রতি কৃপামিশ্রিত।

হয়তো একারণেই মুমূর্ষু এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বিয়ে করতে আপত্তি করেনা সে। এবং সহমরনের চিতা থেকে উঠে গিয়ে, পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষায় রাজীবের কাছে থাকতে গিয়েও শর্তারোপ করে। "যদি প্রতিজ্ঞা কর, কখনও আমার ঘোমটা খুলিবে না, আমার মুখ দেখিবে না- তবে আমি তোমার ঘরে থাকিতে পারি"[১২] রাজীব তখন বলে -"তুমি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া থাকিয়ো'- আমাকে ছাড়িয়া গেলে আর আমি বাঁচিব না"[১৩]। বলে তাঁর সমস্ত শর্ত মেনে নিয়েছে। তারপর রাজীবকে দেখি -'ঘরে যাহা কিছু ছিল সমস্ত ফেলিয়া' মহামায়াকে নিয়ে সাহেব যেখানে বদলি হয়েছে সেখানে ছুটে যেতে। এখানে মহামায়াকে পেয়ে রাজীবের মন পরিপূর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়েছে, তাই সবকিছু ফেলে কেবল তার ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ বস্তুটি নিয়ে নতুন ভাবে সংসার সাজাতে সচেষ্ট। না, আমরা যেমনটি ভাবি তেমনটি হয়না। গল্পে

Dhaka University Institutional Repository

একটু এগিয়ে দেখি "মহামায়া এখন রাজীবের ঘরে, কিন্তু রাজীবের জীবনে সুখ নাই। অধিক নহে, উভয়ের মধ্যে কেবল একখানি মাত্র ঘোমটার ব্যবধান। কিন্তু সেই ঘোমটাটুকু মৃত্যুর ন্যায় চিরস্থায়ী, অথচ মৃত্যুর অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক।"[১৪] কেননা পুরুষের প্রেম-পিপাসা কেবল নারীর দেহ মন নিয়েই নয়, তার রূপ সৌন্দর্য নিয়েও নারীর রূপলাবন্যই পুরুষের কল্পনাকে করে প্রদীপ্ত ও প্রসারিত। আর নারী হয়ে ওঠে অর্ধেক মানবী এবং অর্ধেক কল্পনার বস্তু । তাই নৈরাশ্যে মৃত্যুর বিচ্ছেদ ভুলা সহজ হলেও ঐ ঘোমটার বিচ্ছেদটুকু ভুলতে পারে না সে। কারণ সেখানে 'একটি জীবন্ত আশা' প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে পীড়িত হয়। বিয়েহীন এমন ঘোমটা টানা দাম্পত্য জীবন বড় অসুখের মনে হয়েছে আমাদের। তবু 'এই দুই সঙ্গীহীন একক প্রাণী কতকাল একত্র যাপন করিল' সমাজের দৃষ্টিতে এটি অসামাজিক প্রেম হলেও শেষ পর্যন্ত তা টিকেনি। চিতার আগুনে সুন্দর মুখশ্রী যৌবনের অপূর্ব লাবণ্য হারিয়ে নানা দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত ঘোমটার আড়ালে থেকে সে রাজীবের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিলে, রাজীব তা মেনে নেবার পর থেকে ঐ ঘোমটাখানি মহামায়ার আত্মঅহমিকার বিজয়কেতন। যেদিন সে ঐ ঘোমটাকে অস্বীকার করে তার মুখ দেখেছে, সেদিনই সে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অভিযোগে রাজীবের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। আমরা দেখি যে মহামায়ার চরিত্রের মূল সমস্যা তার ব্যক্তিত্বের সমস্যা। সে তার দাদার মত ব্যক্তিত্বপূর্ণ গম্ভীর, গর্বিত, সংকল্পে অটল, অপ্রতিহত। তাই সে কৌলীন্য ও সহমরণ প্রথার দ্বারা দেহ-মনে আহত হয়েও দীপ্তব্যক্তি মহিমায় উঠে দাঁড়িয়েছে সে। তাঁর চরিত্রের স্ববিরোধীতাও আছে। তাঁর দাদার সামনে নির্ভয়ে রাজীবকে অপেক্ষা করতে বললেও, মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধকে বিয়ে করতে অমত করেনি সে। বিশেষ একটি রীতি সমর্থনে চিতায় অগ্নিদগ্ধ হতে যায়, আবার ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পালিয়ে আত্মরক্ষা, ইত্যাদিতে আমরা তার প্রমাণ পাই।

আমরা আরো লক্ষ করি যে, "মহামায়ার হৃদয় গভীরের উদ্বেল প্রেমকে সংযত ও মূক করে রেখেছিল তার আত্মগর্ব ভবানীচরণের সামাজিক পারিবারিক কর্তৃত্ব নয় ; তার কৌলিন্য অহংকার তার নিজেরই। --কৌলিন্য সহমরন বিধ্বস্ত যুগে মহামায়া একজনকে ভালোবেসেছিল বলেই তার নারীত্ব স্বাতন্ত্র্যলাভ করেনি। হৃদয় স্বাতন্ত্র্যের জন্যই সে প্রেমিককে প্রত্যাখ্যান বা গ্রহণ করেছে। ভালোবাসাকে স্বীকার বা অমান্য করেছে"[১৫] তাই তাঁর "ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি সুদীর্ঘ দগ্ধচিহ্ন"[১৬] রেখে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ত্যাগ

ত্যাগ (১২৯৯) সমাজ সমস্যা পীড়িত প্রেমের গল্প। বিদ্রোহী প্রেমের গল্প হিসেবেও উপভোগ্য। যে কালে 'বিলেত' গেলে প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে ঠাঁই মিলত না- কাহিনীটি সে কালের । হেমন্ত কুসুমের প্রেম, হরিহর মুখুজ্জের সামাজিক প্রথার খড়গহস্ত এবং প্যারিশংকর ঘোষালের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র -তিনপক্ষের এই ত্রিমুখী ক্রিয়ার মিশ্রণ গল্পের অবয়ব।

সামাজিক প্রথা ও বর্ণ বৈষম্য এ গল্পের দুটি দাম্পত্য সম্পর্ককে সংকটে ফেলেছে। এর একটি প্যারিশংকর ঘোষালের একমাত্র কন্যার জামাতা নব-কান্তের, অপরটি হেমন্ত ও কুসুমের। প্রথমটির জন্য দায়ী হরিহর মশায়, দ্বিতীয়টি প্রথমটির পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট, দায়ী প্যারিশংকর ঘোষাল।

"শিল্প সৃষ্টি হিসেবে 'ত্যাগ' গল্প 'দেনাপাওনা' অপেক্ষা উন্নততর। 'দেনাপাওনা' যেমন পণ-প্রথা এসেছে কেন্দ্রীয় সমস্যারূপে, তেমনী কেন্দ্রীয় সমস্যা 'ত্যাগ' গল্পের হচ্ছে অসবর্ণ বিবাহ। এমনিতে সে সময় হিন্দু সমাজের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ অসম্ভব ছিল, তাই গল্পের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহটি ঘটেছে তৃতীয় পক্ষের একটি চক্রান্তের ফলে"[১৭]। যে কারণে একটি সুখী দম্পতির উপর এসে পড়ে অসুখের ছায়া। তাই 'সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধ ফুলের গাছটিকে সচেতন' করে তুলবার সকল আয়োজন ব্যর্থ হয়ে আসে হেমন্তের । তাঁর চাঞ্চল্য, স্পর্শ প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। তবু ধ্যান ভাঙ্গেনা 'চন্দ্রালোক প্লাবিত অসীম শূন্যে' নিমগ্ন স্ত্রী কুসুমের।' মস্ত দূরবীণ দিয়ে বিস্তর ঠাহর করে বিন্দুমাত্র দেখার বস্তু হয়ে উঠে সে। কারণ এই জ্যোৎস্নারাত্রি এই বসন্তকাল এক মুহূর্তে ভেঙ্গে যেতে পারে এমন মন্ত্র জানা কুসুমের। কিন্তু হেমন্ত তা শুনতে চায়না, সে চায়- "সপ্তাহের মধ্যে তিনটে চারটে রবিবার আসে কিংবা রাত্রিটা বিকাল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত টিকিয়া যায়।[১৮]" তেমন মন্ত্র শুনতে। কারণ সমস্ত আবেগ উচ্ছ্বাস, ভালোবাসা দিয়ে চির সুন্দর করে শান্তির অমীয় ধারায় সিক্ত করতে চায় সে দাম্পত্য জীবন। কিন্তু গোল বাঁধে তখন, যখন তাঁর কানে আসে পিতার ক্রুদ্ধগর্জন "হেমন্ত বউকে এখনি বাড়ি হইতে দূর করিয়া দাও।"[১৯] প্রনয়ের শক্ত বাঁধন তো আর একটামাত্র উক্তিতে আলগা হতে পারেনা, হেমন্ত এ উক্তির পেছনের সত্যের সন্ধান করে। কুসুমের গম্ভীর দৃঢ়কণ্ঠে সেই সত্যের সবটুকু শুনে হেমন্ত উঠে যায়। কুসুমের আশংকা হয়- 'যে স্বামী চলিয়া গেল সে স্বামীকে আর ফিরিয়া পাইবেনা'। এ-যাওয়া কেবল ব্যক্তি হেমন্তের উঠে যাওয়া নয়, কুসুমের প্রতি তার বিশ্বাস উঠে যাওয়া, তাদের দাম্পত্য জীবন থেকে, সংসার থেকে সুখ-শান্তির উঠে যাওয়া । অথচ এতে কোনো দোষ নেই তাঁর। কারণ সে বিবাহের অনতি পূর্বেও বলেছে-"ইহাতে কাজ নাই জ্যাঠামশায়।--- তুমি রাষ্ট্র করিয়া দাও আমার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে।"[২০] কুলীন ব্রাহ্মণ হেমন্ত কুসুমকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল, না জেনেই যে পাত্রী

Dhaka University Institutional Repository

শৈশববিধবা অনাথা কায়স্থকন্যা। না জানাই উত্তম ছিল তাঁর পক্ষে। কিন্তু সমস্যায় পড়লো সে, সমাজপতি পিতার কাছে এবং নিজের কাছে সেই পরিচয় প্রকাশ পেয়ে। সত্য গোপনকারীই সত্যের প্রকাশক । হেমন্ত তাঁর কাছেই জানতে চাইলো-'আমি তোমার কী করিয়াছিলাম।' প্যারিশংকর জানে, হেমন্ত করেনি, করেছে তার পিতা। এহীন ষড়যন্ত্রের মূলে ছিলো তাঁর জামাতা নব-কান্তকে 'বিলেত' যাওয়ার অপরাধে সমাজচ্যুতিতে হেমন্তর পিতার মূখ্য ভূমিকা।

ঘটনার আড়ালের সব ঘটনা বলতে শুরু করলো প্যারিশংকর-

> "আমার একটি মাত্র কন্যা ছাড়া আর সন্তান নাই, আমার সেই কন্যা তোমার বাপের কাছে কী অপরাধ করিয়াছিল।---- তোমার বাপ গ্রামের দলপতি হইয়া বলিলেন,'মেয়েকে যদি স্বামীগৃহে পাঠানো অভিপ্রায় থাকে তবে সে মেয়েকে আর ঘরে লইতে পারিবে না।' আমি তাহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলাম, দাদা এ যাত্রা তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি ছেলেটিকে গোবর খাওয়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইতেছি, তোমরা তাহাকে জাতে, তুলিয়া লও। তোমার বাপ কিছুতেই রাজি হইলেন না।"[২১]

এভাবে গল্পের চার অনুচ্ছেদের সবচেয়ে বড় তৃতীয় অনুচ্ছেদ জুড়ে প্যারিশংকরের হীন ষড়যন্ত্রের নেপথ্য কাহিনী বর্ণিত। এতে হেমন্ত কুসুমের পূর্বরাগ পর্যায়ের বিবরণ, তাদের প্রেম, এবং বিবাহ সংঘটনের বর্ণনাও হেমন্ত শুনেছে তার কাছে। "দুটি নবীন প্রাণকে জালে ফেলে মিলনের চরিতার্থতায় পৌঁছে দিয়েছে সে।"[২২] গল্পে আমরা লক্ষ করেছি যে, 'তাঁর শয়তানিতে ফাঁক নেই। দীর্ঘকাল ধরে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য শীতলরক্ত ঘাতককে চিত্তে পুষেছে সে। ধীরে পায়ে সুকৌশলে এগিয়েছে। মেয়েটির সঙ্গে প্রীতির অভিনয় করেছে। সময় ও প্রয়োজন মত তার দুঃখে বিগলিত হয়েছে। এবং যথা কালে বলির খড়্গ নামিয়ে এনেছে।' তাই, 'এই যে মেয়েটিকে আমি পরিত্যাগ করিব, ইহার দশা কী হইবে। আপনি ইহাকে আশ্রয় দিবেন? "[২৩] হেমন্তের এমন জিজ্ঞাসায় সে দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিয়েছে "আমার যাহা কাজ তাহা আমি করিয়াছি, এখন পরের পরিত্যক্ত স্ত্রীকে পোষণ করা আমার কর্ম নহে।"[২৪] এখানে প্যারিশংকরের কুৎসিত চেহারাটা আমাদের কাছে আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গল্পের শুরু থেকেই আমরা কুসুমের প্রতি হেমন্ত'র গভীর ভালোবাসা লক্ষ করেছি। এবং কুসুমকেও- 'চারিদিকে প্রলয়, মাঝখানে একটি বিচারক এবং তাহার পায়ের কাছে একটি অপরাধিনী'র মতো বসে থাকতে দেখেছি। হেমন্ত, জাতি-ধর্ম রক্ষার্থে পিতার যে আদেশ পেয়েছিল, তার জবাব দিতে তার সময় লেগেছে পাঁচদিন-পূর্ণিমা থেকে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী পর্যন্ত। এ সময়টুকু লেখকের অভিপ্রায়ে হেমন্তকে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব দানের সময় বলে আমাদের মনে হয়েছে। তাই গল্পের শেষে "অনেক্ষণ হইয়া গিয়াছে,

Dhaka University Institutional Repository

আর সময় দিতে পারি না, মেয়েটিকে দূর করিয়া দাও।"[২৫] পিতার এহেন উক্তিতে বিচলিত হয়নি সে। তখন কুসুমকে দেখি, হেমন্ত'র দুই পা দ্বিগুণতর আবেগে 'চেপে ধরতে এবং চরণ চুম্বন' করে সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়ে পা ছেড়ে দিতে। কিন্তু তাকে ফিরিয়ে আনতে হেমন্ত পিতার অবাধ্য হয়ে বলেছে- 'আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না'। এবং 'আমি জাত মানিনা'। "এগুলি প্রণয়ে উচ্ছৃল নব্য যুবকের কথা মাত্র নয়, সুস্থির সিদ্ধান্ত।"[২৬] বর্ণবৈষম্য ও জাতি ধর্মের বিরুদ্ধে ঐ-টুকু বিদ্রোহের মন্ত্রই যথেষ্ট। জাত বাঁচাতে, স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে পিতার আদেশ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি হেমন্তের। কারণ সে একটা নিরপরাধ জীবনের মর্মমূলে এই অন্যায় আঘাত কিছুতেই দিতে পারেনি, তাঁর সমস্ত বুদ্ধি বিবেক তাকে এই নিষ্ঠুর অন্যায় সাধন থেকে বিরত করেছে। সে পিতার গৃহ ত্যাগ করেছে, স্ত্রীকে ত্যাগ করেনি। এখানে হেমন্ত কুসুমের সম্পর্কটি সমাজের বিভিন্ন বৈষম্যের দেয়াল টপকে আপন মহিমায় উজ্জ্বলতা পেয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে কুসুমের আশংকাগুলোকে মিথ্যে করে দিয়ে কেবল হেমন্ত নিজেই নয়, আমাদের ও সুখী করেছে। এমন কি অসুখে সমাজের'পরেও পড়েছে সেই ছায়া।

৫.মধ্যবর্তিনী

মধ্যবর্তিনী গল্পটি একটি জটিল হৃদয় বেদনার গল্প । আর সেই 'প্রেম ও বেদনা ' সাধারণ অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে বিচার সীমার বাইরে। কারণ স্ত্রী হরসুন্দরী তাঁর স্বামী নিবারণ-কে 'দুগ্ধফেনের মতো শুভ্র, নবনীর মতো কোমল, শিশু-কন্দপের মতো সুন্দর একটি স্নেহের পুত্তলি সন্তান"[২৭] দেওয়ার অতৃপ্ত ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে সে-'একটা বৃহৎ দুঃখের উপর আপনাকে নিক্ষেপ করে এই বেদনার জন্ম দিয়েছে। এবং তাতে তার যে অসামান্য আত্মবঞ্চণার দিক এ-গল্পে স্পষ্ট হয়েছে তা আমাদের সাধারণ দুঃখবোধের সীমার বাইরের বস্তুই । নিবারণের ও হরসুন্দরী কয়েকটি পরস্পর সংলাপ তুলে ধরে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে–

ঃ "আমাদের তো ছেলেপুলে কিছুই হইল না , তুমি আর একটি বিবাহ করো।"[২৮]

-বুড়াবয়সে একটি কচি খুকিকে বিবাহ করিয়া আমি মানুষ করিতে পারিবনা।'[২৯]

ঃ সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মানুষ করিবার ভার আমার উপর রহিল।

-আমার আপিস আছে ,কাজ আছে, তুমি আছ, কচি মেয়ের আবদার শুনিবার অবসর আমি পাইব না।"[৩০] শৈলবালাকে বিয়ের পর-

ঃ আরে পালাও কোথায় । ঐটুকু মেয়ে , ও তো তোমাকে খাইয়া ফেলিবে না।"

Dhaka University Institutional Repository

-আরেরোসো রোসো, আমার একটু বিশেষ কাজ আছে।"

ঃ আহা, পরের মেয়েকে ঘরে আনিয়া অমন হতশ্রদ্ধা করিতে নাই।"

এবং শৈলবালাকে ধরে নিবারণের বাম পাশে বসিয়ে,জোর করে ঘোমটা খুলে তার চিবুক ধরে বলেছে-

"আহা, কেমন চাঁদের মতো মুখখানি দেখ দেখি।"[৩১]

তারপর, একদিন শৈলবালাকে সংসারের ছোটখাট কাজকর্ম শেখানোর সময় এই নিবারণই হরসুন্দরীকে বলেছে-

"ছেলেমানুষ, উহাকে তুমি বড়ো বেশি পরিশ্রম করাইতেছ, উহার শরীর তেমন সবল নহে।" [৩২]

তখন হরসুন্দরীকে আমরা কোনো প্রতিবাদ বা মনঃক্ষুণ্ন হতে দেখিনা, বরং তাকে বলতে শুনি-

"তোমরা দুই শিশুতে মিলিয়া খেলা করো, সংসারের সমস্ত ভার আমি লইলাম"[৩৩]

এই সব কিছুর পেছনে হরসুন্দরীর একটাই ইচ্ছে ছিল স্বামীকে সুখী করা, স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা বিশেষ রূপে আরও সার্থক করে তোলা। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি , যেটুকু দাম্পত্য সুখ-শান্তি তাদের সংসারে ছিল তাও যেন খোয়া গেছে; করুণ বাস্তবতার মধ্যে।' আমরা দেখি যে, দীর্ঘ রোগাবসানে ক্ষীণ রক্তহীন পাণ্ডুর' হরসুন্দরী-কে একা ঘরে রেখে নিবারণ শৈলবালাকে নিয়ে অন্য ঘরে শয়ন করে। "আট বছর বয়সে বাসররাতের সেই শয্যা দীর্ঘ সাতাশ বছর পরে ছেড়ে যাওয়ায় সধবা হরসুন্দরী'র কাছে তা 'বৈধব্যশর্য্যা' মনে হলেও আমাদের কাছে এর চেয়ে একটু বেশি কিছু মনে হয়। মনে হয়, নিবারণ ও হরসুন্দরী'র মধ্যবর্তিনী শৈলবালা'র অস্তিত্ব তাদের সাতাশ বছরের দাম্পত্যে ও সুখ-শান্তির উপর এক করুণ শোক শয্যা।"[৩৪] 'মধ্যবর্তিনী'ও সুখী হয়নি,। "ভাগাভাগি করিয়া একজন নারী হইল দাসী, আর- একজন নারী হইল রানী;তাহাতে দাসীর গৌরব গেল, রানীর সুখ রহিল না।"[৩৫]

ড.ক্ষেত্রগুপ্ত 'মধ্যবর্তিনী' গল্পটিকে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন- "বঙ্কিমের আড়ম্বরের জগৎ থেকে জীবনের কাছে তিনি সমস্যাটি নিয়ে এলেন । এর লোকজন সংসার একেবারে সাদামাটা। 'পুরাতন চটিজোড়া'টার সঙ্গে নায়ক নিবারণের পৃথিবীতে উপমিত। নিবারণ নগেন্দ্র নয়, হরসুন্দরী-শৈলবালার সঙ্গেও সূর্যমুখী-কুন্দের তুলনা চলেনা। গল্পটির কোথাও ভাবাবেগ তীব্র ও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেনি। সব-কিছু বাঙালি পরিবারের নেহাত জানাশোনা। স্ত্রীর বর্তমানে প্রৌঢ়ের পুত্রার্থে দ্বিতীয় বিয়ে, তরুণী নবীনার প্রতি মাত্রারিক্ত আকর্ষণ তখনকার বাঙালি সমাজের সুলভ অভিজ্ঞতা এই সমতল-প্রায় জীবনেও হৃদয়ঘটিত সমস্যা চরিত্রের নতুন রহস্য কীভাবে টেনে বের করতে পারে, লুকানো মানসজট আবিষ্কার করতে পারে, সরল মনকে পাক দিয়ে গ্রন্থিবহুল করে তুলতে পারে, তার

Dhaka University Institutional Repository

খোঁজ লেখক পেয়েছেন। এবং সর্বদা সতর্ক থেকেছেন তার মানুষগুলো যেন বঙ্কিমের লোকদের থেকে পৃথক হয় । সে সতর্কতা ফলপ্রদ হয়েছে।"[৩৬]

'মধ্যবর্তিনী' গল্পের হরসুন্দরী এক হিসাবে মহামায়ার সমগোত্রীয়া। নারীর তীব্র আত্মঅহমিকা মহামায়ার মধ্যে যেমন,তেমনি হরসুন্দরীর মধ্যেও। স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা হরসুন্দরীর মনে সেই দীপ্ত অহমিকার জন্ম দিয়েছে,যার তেজে স্বাচ্ছন্দ্যে সে সংসারে সতীন নিয়ে আসার প্রস্তাব পর্যন্ত স্বামীকে দিতে পেরেছে। নারীর জীবনের সবচেয়ে যন্ত্রণার বিষয় বোধ হয় সতীনের সংসার। সেই সতীন-যন্ত্রণাকে হরসুন্দরী কিছু -না মনে করতে পারার মতো ঔদ্ধত্য পোষণ ক'রে বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করেছে ভালোবাসার অহমিকায় উদ্দীপ্ত হয়ে।[৩৭]

৬. সমাপ্তি

'সমাপ্তি' গল্পটি প্রকৃতিসংলগ্ন প্রেমের গল্প। এতে তরুণ হৃদয়ের রোমান্টিক প্রেমানুভূতিই মুখ্য; যা ভাষার নিপুণতা, মৃদু কৌতুক এবং সহাস্য কটাক্ষে অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। এবং তা গ্রামজীবনের সমস্যা-বলয়মুক্ত। রবীন্দ্রনাথ যে সহজ সরল জীবনের ছোট সুখ ছোট দুঃখের কাহিনী লেখার কথা ভেবেছিলেন সেই জীবনের কাহিনী এটি। এক কথায় "কৈশোরের চপলা বালিকা কিভাবে ধীরে ধীরে যৌবনের "গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণী" মূর্তিতে বিকশিত হয়ে ওঠে 'সমাপ্তি' গল্প হচ্ছে তারই এক অপূর্ব রসমধুর কাহিনী।"[৩৮] এবং এতে প্রেম ও প্রকৃতি একান্ত কাছাকাছি, মিলে মিশে স্নিগ্ধতায় পরিবেশিত।

এক শ্রাবণের ভরা নদীর নৌকায় আসীন যুবক অপূর্বকৃষ্ণকে নিয়ে কাহিনীর শুরু, এবং তার সঙ্গে সেই নদীর পারে ইঁটের স্তূপের উপর বসে থাকা মৃন্ময়ী- 'যে দেশে ব্যাধ নাই, বিপদ নাই, সেই দেশের হরিণ শিশুর মতো নির্ভীক' [৩৯] হিসেবে চিহ্নিত। কৌতূহলী একটি বালিকা । এই বালিকাকেই পরে আমরা নারীতে রূপান্তরিত হতে দেখি , একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে-"অনেক দিনের একটি হাস্যবাধায়-অসম্পন্ন চেষ্টা আজ অশ্রুজলধারায় সমাপ্ত হইল।"[৪০] এর মধ্য দিয়ে কাহিনীর শেষ। মাঝে এই গল্পের বিশেষ ঘটনাগুলোর মধ্যে- প্রথমত নৌকা হতে নামার সময় ব্যাগ-সমেত অপূর্ব'র কাদায় পড়ে যাওয়া এবং তা অবলোকনে মৃন্ময়ীর উচ্চ কণ্ঠের তরল হাসি। "আয়োজনটি অতি সুন্দর হইয়াছিল । নদীর তীর, গাছের ছায়া,পাখির গান,প্রভাতের রৌদ্র, কুড়ি বৎসর বয়স; অবশ্য ইঁটের স্তূপটা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার উপর বসিয়া ছিল সে এই শুষ্ক কঠিন আসনের প্রতিও একটি মনোরম শ্রী বিস্তার করিয়াছিল। হায়, এমন দৃশ্যের মধ্যে প্রথম পদক্ষেপমাত্রেই যে সমস্ত কবিত্ব প্রহসনে পরিণত হয় ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতা আর কী হইতে পারে।"[৪১]

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত-পাত্রী দেখাকে কেন্দ্র করে অপূর্ব- মৃন্ময়ী পরস্পরের আরেকটু কাছাকাছি আসা, সামাজিক দিক থেকে সুযোগ্যা পাত্রীর পাশাপাশি মৃন্ময়ীর চঞ্চল স্বভাবের প্রতি অপূর্বর বিশেষ দৃষ্টি। অপূর্ব'র নতুন জুতাজোড়া ফিরিয়ে দিতে গিয়ে তার হাতে ধরা পড়ার পরও শাস্তি না পাওয়ার জন্য মৃন্ময়ী'র বালিকা হৃদয়ে অন্য রকম শাস্তি অনুভব।

> "মৃন্ময়ী আঁকিয়া-বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পালাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কোঁকড়া চুলে বেষ্টিত তাহার পরিপুষ্ট সহাস্য দুষ্ট মুখখানির উপরে শাখান্তরালচ্যুত সূর্যকিরণ আসিয়া পড়িল। রৌদ্রোজ্জ্বল নির্মল চঞ্চল নির্ঝরিণীর দিকে অবনত হইয়া কৌতূহলী পথিক যেমন নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাহার তলদেশ দেখিতে থাকে অপূর্ব তেমনি করিয়া গভীর গম্ভীর নেত্রে মৃন্ময়ীর ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত মুখের উপর, তড়িত্তরল দুটি চক্ষুর মধ্যে চাহিয়া দেখিল এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে মুষ্ঠি শিথিল করিয়া যেন যথাকর্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়া বন্দিনীকে ছাড়িয়া দিল । অপূর্ব যদি রাগ করিয়া মৃন্ময়ীকে ধরিয়া মারিত তাহা হইলে সে কিছুই আশ্চর্য হইত না , কিন্তু নির্জন পথের মধ্যে এই অপরূপ নীরব শাস্তির সে কোনো অর্থ বুঝিতে পারিল না।"[৪২]

এই ঘটনার পর আমরা অপূর্বকৃষ্ণকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিতে দেখি মৃন্ময়ীকে । পাড়ার লোকে তাঁর এই পছন্দটিকে অপূর্ব পছন্দ মনে হলেও তাঁর মা'য়ের হয় না। তখন- 'মৃন্ময়ীকে ছাড়া আর-কাহাকেও বিবাহ করিব না' বলে সে অটল থাকে। অপূর্ব'র মাকে শেষ পর্যন্ত সম্মত হতে দেখি। এবং "ক্রীড়াসক্তি, দ্রুতগমন, উচ্চহাস্য, বালকদিগের সহিত আলাপ এবং ক্ষুধা অনুসারে ভোজন "[৪৩] মায়ের কাছ থেকে ইত্যাদি উপদেশ-পরামর্শ -শুনে মৃন্ময়ী উৎকণ্ঠিত- শঙ্কিত হতে দেখি। তাঁর কাছে বিয়েকে মনে হয়েছে- 'যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং তদবসানে ফাঁসির হুকুম।' তারপর- 'আমি বিবাহ করিব না'- এমন অসম্মতি সত্বেও বিয়ে হয়েছে মৃন্ময়ীর। এবং তাঁর সমস্ত পৃথিবী অপূর্বর মা'র অন্তঃপুরে এসে বন্দী হয়ে পড়েছে ।

"দেখো বাছা, তুমি কিছু আর কচি খুকি নও, আমাদের ঘরে অমন বেহায়াপনা করিলে চলিবে না।"[৪৪] কিন্তু শাশুড়ীর সেকথার অর্থ সে বুঝেনি। সে বটতলায় রাধাকান্ত ঠাকুরের ভাঙা রথের মধ্যে গিয়ে বসে থেকেছে। প্রথম দিকে অপূর্ব'র সঙ্গে কথোপকথনেও আমরা তার বিয়ে, দাম্পত্য-জীবন তথা স্বামী-সংসারের প্রতি কোনোরূপ অনুভূতিই অনুভব করি না। অপূর্ব যখন তাকে কিছুতেই বাহুডোরে বাঁধতে না পেরে, প্রশ্ন করেছে-'

Dhaka University Institutional Repository

"মৃন্ময়ী, তুমি আমাকে ভালোবাস না?' উত্তরে মৃন্ময়ী বলেছে-'না । আমি তোমাকে কক্খনোই ভালোবাসব না' কেন,আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছি।' -'তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন ।"[৪৫]

অন্য একদিন অপূর্ব যখন মৃন্ময়ীর কাছে একটি চুম্বন প্রার্থনা করলে মৃন্ময়ী হেসে উঠেছে এবং হাসি সংবরণ করে কাছাকাছি গিয়ে দুইবার চেষ্টা করেও অপূর্বকে চুম্বন করতে পারেনি। অপূর্ব তখন শাসনচ্ছলে তাঁর কানমলে দিলেও স্বামীর অধিকার আদায়ে অধৈর্য হয়নি। কারণ দস্যুবৃত্তি করে কেড়ে লুটে লওয়াকে সে আত্মাবমাননা মনে করে। সে দেবতার মতো সগৌরবে থেকে স্বেচ্ছানীত উপহার, পেতে চায় নিজের হাতে কিছুই তুলে নিতে চায় না। তাই সে স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে কলকাতায় চলে গেছে। অপূর্ব কলকাতায় চলে গেলে মৃন্ময়ীর মনে পরিবর্তনের দোলা লেগেছে। একটি আঘাত এসে তাঁর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে চির ধরিয়ে দিয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে মৃন্ময়ীর কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে অপূর্ব'র সমস্ত স্মৃতি।

"সেই বিদায়ের দিনের যে চুম্বন অপূর্বর মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই অসম্পূর্ণ চুম্বন এখন মরুমরীচিকাভিমুখী তৃষার্ত পাখির ন্যায় ক্রমাগত সেই অতীত অবসরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, কিছুতেই তাহার আর পিপাসা মিটিল না। এখন থাকিয়া থাকিয়া মনে কেবল উদয় হয়, 'আহা,অমুক সময়টিতে যদি এমন করিতাম, অমুক প্রশ্নের যদি এই উত্তর দিতাম, তখন যদি এমন হইত।'.... চুম্বনের এবং সোহাগে ঋণগুলি অপূর্বর মাথার বালিশের উপর পরিশোধ করিতে লাগিল।"[৪৬]

'তুমি চিঠি না লিখলে আমি বাড়ি ফিরব না' বলে অপূর্বর বলে যাওয়া এই কথাটিও তার কাছে অহরহ যন্ত্রণার কারণ হয়েছে । তাই সে – 'এইবার তুমি আমাকে চিঠি লিখো, আর কেমন আছো লিখো, আর বাড়ি এসো, মা ভালো আছেন,'বলে অপূর্বকে চিঠি লিখেছে। এ ভাবে অপূর্বর অনুপস্থিতিতে মৃন্ময়ীর নারী হৃদয় এবং স্বামীর প্রতি কর্তব্যবোধ বেড়ে উঠেছে। এবং একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়ে যখন তাদের দু'জনের মিলন ঘটানো হয়েছে তখই এই গল্পের সমাপ্তি হয়েছে।

৭. প্রতিহিংসা

প্রতিহিংসা (১৩০০) গল্পের কেন্দ্রবিন্দু ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণী স্বামীগতপ্রাণা আদর্শ কুলবধু। তাঁর প্রতি নয়নতারার নিছক মেয়েলি ঈর্ষা থেকেই 'প্রতিহিংসা গল্পের জন্ম। গার্হস্থ্য-জীবন ভিত্তিক -এ গল্পটি প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে পরিণতি লাভ করেছে। গল্পে- আমরা দেখি যে, একদিকে নয়নতারা

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীকে প্ররোচিত করেছে ইন্দ্রাণীর স্বামী অম্বিকাচরণের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে ইন্দ্রাণী তার স্বামীকে প্রভাবান্বিত করছে তাঁর মতামত গঠনে। ফলে, একটা সংকট সৃষ্টি হয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে তাদের পারিবারিক জীবন সংসারে এবং ইন্দ্রাণী অম্বিকার দাম্পত্য জীবনে। স্থির ব্যক্তিত্বের এক সুন্দরী নারীর বাস্তব প্রতিমূর্তি ইন্দ্রাণী।

> "আমাদের ভাষায় সুন্দরীর সহিত স্থির-সৌদামিনীর তুলনা প্রসিদ্ধ আছে। সে তুলনা অধিকাংশ স্থলেই খাটে না কিন্তু ইন্দ্রাণীতে খাটে। ইন্দ্রাণী যেন আপনার মধ্যে একটা প্রবল বেগ এবং প্রখর জ্বালা একটি সহজ শক্তির দ্বারা অটল গাম্ভীর্যপাশে অতি অনায়াসে বাধিয়া রাখিয়াছে।"[৪৭]

ইন্দ্রাণীর বাহ্যিক রূপ- সৌন্দর্য, তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বভাব এবং অনেক গহনা পরিয়া অত্যন্ত সুসজ্জিত হওয়াই ছিল তাঁর প্রভুপত্নী নয়নতারার ঈর্ষার প্রধান কারণ। তাই নয়নতারা অত্যন্ত হীনভাবে ইন্দ্রাণীকে- 'আমাদের ম্যানেজারের স্ত্রী' আমাদের দেওয়ানের নাতনি ইত্যাদি বলে এবং একজন মুখরা দাসীকে ইন্দাণীর নিন্দা সমালোচনা করতে নিয়োজিত করেছে। দাসী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও 'হাটখোলার পালকিতে খাবার তুলে দিয়ে আসার হুকুম দিয়েছে। এবং তাঁর স্বামীকে সে মন্ত্র দিয়েছে এই বলে যে- "তুমি তো নিজে কিছুই দেখ না, তোমাকে অম্বিকা হাত তুলিয়া যাহা দেয় তাহাই তুমি শিরোধার্য করিয়া লও; এ দিকে ভিতরে ভিতরে কী সর্বনাশ হইতেছে তাহা কেহই জানে না। তোমার ম্যানেজারের স্ত্রী যা গয়না পরিয়া আসিয়াছিল, এমন গয়না তোমার ঘরে আসিয়া কখনও চক্ষেও দেখি নাই। এ-সব গয়না সে পায় কোথা হইতে এবং এত দেমাকই বা তাহার বাড়িল কিসের জোড়ে।"[৪৮] স্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করলো দুর্বল ব্যক্তিত্বহীন বিনোদ। 'কিন্তু সে প্রত্যক্ষভাবে কোনো উপায় অবলম্বন করতে সাহস করল না । এক চক্ষু লজ্জা; দ্বিতীয় আশঙ্কা, পাছে সমস্ত-অবস্থাভিজ্ঞ অম্বিকাচরণ তার কোনো অনিষ্ট করে এই ভয়ে। ফলে তাঁদের দাম্পত্য জীবনে দেখা দিল কলহ, যখন-তখন স্ত্রী নয়নতারার পীড়ন অব্যহত থাকলো তাঁর উপর। অবশেষে নয়নতারা স্বামী বিনোদের এহেন কাপুরুষতায় জ্বরে পুড়ে অস্থির হয়ে তাঁর অজান্তে একদিন অম্বিকাচরণকে ডেকে পর্দার আড়াল থেকে,সে বলল-"তোমাকে আর রাখা হবে না, তুমি বামাচরণকে সমস্ত হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাও।"[৪৯] অথচ অম্বিকাচরণ সুশিক্ষিত, ওকালতি এবং সম্মানজনক কাজ লাভে সক্ষম, ক্রোধে-সংযমে -প্রেমে-ক্ষমায় একজন যথার্থ সত্য - সফল ব্যক্তিত্ব। সে পার্শ্ববর্তী জমিদারের জমিতে হস্তক্ষেপ করে না, মকদ্দমা বাধার আগেই আপসের চেষ্টা করে, নিজের এবং প্রভুর সংসারে সুখ-শান্তি যাতে নষ্ট না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখে। আর সে কারণেই আমরা দেখি যে, বিস্তর ধার দেনায় ক্ষতিগ্রস্ত বিনোদবিহারীর 'বাঁকাগাড়ি পরগণা' যখন হাত ছাড়া হবার উপক্রম, তখন সে সমস্ত অপমান ভুলে বিনোদের পাশে দাড়িয়েছে। খাজাঞ্চি'র কাছ থেকে ইস্তফাপত্র

Dhaka University Institutional Repository

ফেরত নিয়ে অন্তঃপুরে এসে স্ত্রী ইন্দ্রাণীকে বলেছে- "বিনোদের এ অবস্থায় তো আমি কাজ ছেড়ে দিতে পারি নে।"[৫০] ইন্দ্রাণীও অবশেষে অন্তরের সমস্ত বিরোধ দ্বন্দ্ব সবলে দমন করে তাকে সম্মতি দিয়েছে। বিনোদ যখন অনেক অনুনয়-বিনয় করে, কাঁদা-কাটি করে, অনেক দীনতা স্বীকার করে স্ত্রী নয়নতারার কাছ থেকে গহনা ভিক্ষা পায়নি,"তখন ইন্দ্রাণী লোহার সিন্দুক খুলিয়া তাহার সমস্ত গহনা একটি বৃহৎ থালায়

স্তূপাকার করিল এবং সেই গুরুভার থালাটি বহু কষ্টে দুই হস্তে তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া তাহার স্বামীর পায়ের কাছে রাখিল।.....'আমার এই গহনাগুলি দিয়া আমার পিতামহের দত্ত দান উদ্ধার করিয়া আমি পুনর্বার তাঁহার প্রভুবংশকে দান করিব।'.... বাঁকাগাড়ি পরগনা পুনশ্চ ক্রয় হইয়া গেলে , তখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গতভূষণা ইন্দ্রাণী আবার নয়নতারার অন্তঃপুরে নিমন্ত্রণে গমন করিল, আর তাহার মনে কোনো অপমান-বেদনা রহিল না।"[৫১] এখানে গতভূষণই ইন্দ্রাণীর অহংকার–'নীরব অভিজাত গর্বোদ্ধত প্রতিহিংসা।' গল্পটিতে আমরা দুইটি বিপরীতমুখী নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে দুইটি দাম্পত্য জীবনের সুখ-অসুখের যে চিত্র পাই, তা আমাদের একান্ত পরিচিত বাস্তব চিত্র বলেই মনে হয়।

৮.আপদ

'আপদ' গল্পটি বাৎসল্যপ্রীতি পর্যায়ের। গল্পে-নৌকা ডুবিতে, যমরাজ ও অধিকারী মহাশয়ের হাত থেকে আত্মরক্ষাকারী ব্রাহ্মণ বালক নীলকান্ত শরৎ বাবু'র বাগানে আশ্রয় নেয়। শরৎ বাবু এবং তার মায়ের মতে- এই বালকই 'আপদ'। কিন্তু অসুস্থ কিরণময়ীর মাতৃহৃদয়ের কাছে অত্যন্ত স্নেহেরবস্তু সে। কাজেই কিরণময়ীর দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েন সৃষ্টি, সুখ -অসুখের পরিবেশ- ভাংতে ও গড়তে অনেকখানি ভূমিকা তার। কিরণময়ীর সংস্পর্শে আসার পর নীলকান্ত'র নিজেকে কেবল যাত্রাদলের সামান্য ছোকরা মনে হয়নি। কেননা, পূর্বের অভ্যস্ত গানগুলো এখন যখন কিরণময়ীর স্নেহস্পর্শে জাগ্রত হৃদয়-মন নিয়ে গায় তখন-

> ''তাহার তুচ্ছ জীবনটা গানে তর্জমা হইয়া একটা নূতন চেহারা ধারণ করিত...গানের সুরের মধ্যে এই যাত্রাদলের ছেলেটি আপনাকে এবং আপনার জগৎটিকে একটি নবীন আকারে সৃজন করিয়া তুলিত-জলের ধ্বনি, পাতার শব্দ, পাখির ডাক এবং যে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মীছাড়াকে আশ্রয় দিয়াছেন তাঁহার সহাস্য স্নেহমুখচ্ছবি, তাঁহার কল্যাণমণ্ডিত বলয়বেষ্টিত বাহু দুইখানি এবং দুর্লভ সুন্দর পুষ্পদলকোমল রক্তিম চরণযুগল কী-এক মায়ামন্ত্রবলে রাগিনীর মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যাইত।"[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

অলক্ষ্যে নীলকান্তর হৃদয়ের দাবী হয়ে উঠেছিল-কিরণময়ীর প্রীতিস্নেহের একমাত্র অধিকার তার। কিন্তু সমবয়সী সতীশের আগমনে তার সে দাবী মুখথুবরে পড়েছে। সতীশ তাকে সাদরে গ্রহণ করেনি। তার কাছে সে-'কোথাকার একটা কে' অকারণেই তাদের বাড়িতে 'দিব্য রাজার হালে আছে; বৌদির স্নেহকোমল হৃদয় এবং ভালোমানুষির সুযোগ নিচ্ছে।' শরৎ বাবুর পক্ষেও সহ্য করা ছিল অসম্ভব। কিন্তু কিরণময়ীর 'দয়ার দানের ভূরি বিবরণ গল্পে' আছে। ফলে তাদের দাম্পত্য জীবনে সাময়িকভাবে হলেও একটা অশান্তির স্রোত বয়ে গেছে। চন্দননগরের বাগান ছেড়ে স্থায়ীভাবে চলে যাবার সময় নীলাকান্ত'র পোষা কুকুরকে কাঁদতে দেখে কিরণময়ীর মাতৃহৃদয় বিগলিত হয়েছে। চুরির অপবাদ দিলে সে ক্রুদ্ধ হয়েছে, তাকে রক্ষা করেছে। কিন্তু সে ছাড়া তার সংসারের অন্য কেউ সে দরদ দেখায়নি। সতীশের দোয়াত দানের বিষয়টি কিরণময়ীর স্নেহের কাছে বিশাল এক তুচ্ছ । নীলকান্ত প্রতিহিংসাবশত যে-কাজ করেছিল, গল্পে তা 'চুরি, বলে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু,

> "সে চোর নহে; কিরণ যে তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, এ নিষ্ঠুর অন্যায় সে কিছুতেই বুঝাইতেও পারিবে না, বহন করিতেও পারিবে না।"[৫৩]

এই গভীর ট্রাজেডির মধ্য দিয়েই গল্পটি শেষ হয়েছে। এক কথায়-বাগান বাড়ীর "পুরুষদের বিরূপতা এবং কিরণের মমত্ব প্রভৃতি সব মিলে বাঙালি সংসারের সুন্দর জীবন্ত আলেখ্য"[৫৪] এই গল্প।

৯. দৃষ্টিদান

'দৃষ্টিদান'(১৩০৫) সরল ধাঁচের পারিবারিক কাহিনী। গল্পে নারী- পুরুষ উভয়ে উভয়ের প্রতি অতিমাত্রায় সম্মান করে দেবতা- দেবী জ্ঞান করেছে। ফলে তাদের দাম্পত্য -জীবনে দেখা দিয়েছে সংকট । স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহজ প্রেম- সম্পর্কের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে দূরতিক্রম্য দূরত্ব। গল্পের নায়িকা কুমুর স্বগতোক্তিতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে –"আমার স্বামীর কাছে মুহূর্তের জন্য তাহার নাম করিবার অধিকার ছিল না। আমাদের দু'জনার মাঝখানে বাক্যে এবং বেদনায় পরিপূর্ণ এই একটা নীরবতা অটলভাবে বিরাজ করিত।"[৫৫]

বিয়ের পর কুমু স্বামীগৃহে গিয়ে অন্ধ হলেও সেখানে সে লাঞ্ছিত হয়নি। কিন্তু তাঁর অন্ধত্ব তাদের দাম্পত্য সংসারের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে অনেকখানি। স্বামীর সহজ মানবিক প্রেম তাঁর অন্ধত্বে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। প্রথমে অন্য স্ত্রী গ্রহণে কুমুর অনুরোধ উপেক্ষা করে গোপীনাথ ইষ্টদেবতার শপথ করলেও পরে সেই শপথ ভেঙে, হেমাঙ্গিনীকে বিয়ে করতে চেয়েছে। কুমু তাঁর স্বামীর সমস্তই অনুভব করতে পেরেছে,কেবল দেখতে পায়নি। সে স্বামীর পথ চেয়ে অপেক্ষা করেছে। "আজ আমার দৃষ্টিহীন সমস্ত শরীর তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করে। তাঁহার পৃথিবীর সহিত আমার পৃথিবীর যে প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

সাকো ছিল সেটা আজ ভাঙিয়া গেছে। এখন তাঁহার এবং আমার মাঝখানে একটা দুস্তর অন্ধতা; এখন আমাকে কেবল নিরুপায় ব্যগ্রভাবে বসিয়া থাকিতে হয়, কখন তিনি তাঁহার পার হইতে আমার পারে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবেন।"[৫৬]

অথচ কুমু তাঁর অন্ধতা স্বামীর স্বামীর উপর কখনোই চাপাতে চায়নি,'আমার এ বিশ্বজোড়া অন্ধকার, এ আমিই বহন করিব' বলে সে শব্দ -গন্ধ -স্পর্শ দ্বারা সমস্তঅভ্যস্ত কর্ম সম্পন্ন করতে শিখে নিয়েছে। স্বামী সম্পর্কে তাঁর বাল্য সখী লাবণ্য কড়া মন্তব্য করলে কুমু তাকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বুঝিয়ে বলেছে–

> "সংসারে থাকিলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জ্ঞানে অজ্ঞানে ভুলে ভ্রান্তিতে দুঃখ সুখ নানারকম ঘটিয়া থাকে; কিন্তু মনের মধ্যে যদি ভক্তি স্থির রাখিতে পারি তবে দুঃখের মধ্যেও একটা শান্তি থাকে, নহিলে কেবল রাগারাগি রেষারেষি বকাবকি করিয়াই জীবন কাটিয়া যায়। অন্ধ হইয়াছি এই তো যথেষ্ট দুঃখ , তাহার পরে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ করিয়া দুঃখের বোঝা বাড়াইব কেন।"[৫৭]

কিন্তু তার স্বামী তাকে আগের মত গুরুত্ব দেয়নি। কুমুর স্বামীর সঙ্গে মনের সব কথা, বলতে ইতস্ততা করেছে ।

"আমার অন্তরের কথাটা বুঝাইয়া বলিতে পারিব কি না জানি না, কিন্তু নিশ্চয় তুমি নিজে মনের মধ্যে বুঝিতে পার, আমরা দু'জনে যেমনভাবে এক হইয়া জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম আজ তাহা পৃথক হইয়া গেছে।"[৫৮] অন্যদিকে স্বামী স্ত্রীর অন্তর জ্বালা না বোঝে তাকে দেবীর আসনে বসিয়ে, অসামাণ্য রমণী প্রত্যাশা করেছে।

> "তোমার অন্ধতা তোমাকে এক অনন্ত আবরণে আবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে আমার প্রবেশ করিবার জো নাই । তুতি আমার দেবতা, তুমি আমার দেবতার ন্যায় ভয়ানক, তোমাকে লইয়া প্রতিদিন গৃহকার্য করিতে পারি না । যাহাকে বকিব, ঝকিব, রাগ করিব, সোহাগ করিব, গহনা গড়াইয়া দিব, এমন একটি সামান্য রমণী আমি চাই।"[৫৯]

কুমু নিজেকে সেই সামান্য মেয়ে হিসেবে স্বামীকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। সে স্বামীর পায়ের কাছে থাকতে চেয়েছে । সে বলেছে– "আমার বুকের ভিতরে চিরিয়া দেখো! আমি সামান্য রমণী, আমি মনের মধ্যে সেই নববিবাহের বালিকা বই কিছু নই; আমি বিশ্বাস করিতে চাই, নির্ভর করিতে চাই, পূজা করিতে চাই, তুমি নিজেকে অপমান করিয়া আমাকে দুঃসহ দুঃখ দিয়া তোমার চেয়ে আমাকে বড়ো করিয়া তুলিয়ো না– আমাকে সর্ববিষয়ে তোমার পায়ের নীচে রাখিয়া দাও।"[৬০] কিন্তু স্বামী কুমুর নিষেধ সত্ত্বেও, তাকে মূর্ছিত অবস্থায় ফেলে রেখে হেমাঙ্গিনীকে বিয়ে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। জ্ঞান

Dhaka University Institutional Repository

ফিরবার পর সে ঠাকুরঘরে দ্বার রুদ্ধ করে পূজায় বসে এহেন স্বামীর মঙ্গল কামনায় অস্থির হয়েছে। "হে ঠাকুর, আমার স্বামী এখন নদীতে আছেন, তাঁহাকে রক্ষা করো। ....ঠাকুর, আমার অদৃষ্টে যাহা হইবার তা হউক, কিন্তু আমার স্বামীকে মহাপাতক হইতে নিবৃত্ত করো।"[৬১] সত্যি সত্যিই মহাপাপ থেকে তার স্বামী রক্ষা পেয়েছে,অন্য এক ঘটনার মধ্যে দিয়ে; স্বামী বিয়ে করার উদ্দেশ্যে ঘর ছাড়ার মাত্র একদিন আগে কুমুর দাদার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে হেমাঙ্গিনীর। তাঁর দাদা বিয়ে না করার চিরপ্রতিজ্ঞা ভেঙে হেমাঙ্গিনীকে বিয়ে করে তার অতি আদরের ছোট বোনের সেবায় নিয়োজিত করে যেনো অন্ধ কুমুকে দৃষ্টিদান করেছে। ফলে অবসান হয়েছে কুমুদের দাম্পত্য-জীবন সংসারের টানাপোড়েনের। পারিবারিক কাহিনী হলেও সার্বিক বিচারে গল্পটি অন্যসব সার্থক গল্পের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না ।

১০.মাল্যদান

'মাল্যদান' মধুর প্রেমের গল্প। অন্যসব প্রেমের গল্পের মতো কোনো তত্ত্বগত দিক কিংবা সামাজিক কোনো সমস্যা জটিলতা নেই এখানে।''প্রেমের গল্প হিসেবে মাল্যদান'ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প যেখানে প্রেমের প্রথম বিকাশ অবিবাহিতা নায়িকার দিক থেকে দেখানো হয়েছে।''[৬২] অনাথা কুড়ানি এই গল্পের নায়িকা, পটলের আশ্রয়ে সে লালিত-পালিত হয়েছে।এবং আশ্রয় দাতার অতি আদর মিশ্রিত হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে যতীনকে ঘিরে তাঁর প্রেমের বিকাশ।

> "আমার এই ভাইটি কেমন দেখ দেখি ওকুড়ানি, আমার এই ভাইটিকে তোর পছন্দ হইয়াছে ? আমার ভাইকে তুমি বিয়ে করিবি ?"[৬৩] বোনের এমন রসিকতায় কুড়ানির জন্য একটা প্রণয়ের বীজ ধীরে ধীরে অংকুরিত হয়ে সবুজ - সতেজ হয়ে উঠেছে। শুরুতে কথার কথা মনে হলেও পরে তার ভিতরে কুড়ানির জন্য একটা বাড়তি আবেগ তৈরি হয়েছে। কুড়ানির বাবা-মায়ের অনাহারে মৃত্যুর কথা মনে করে সে দুঃখিত হয়েছে। চায়ের পেয়ালা হাতে ভয়ে সকরুণ কুড়ানিকে দেখে তাঁর মনে হয়েছে – 'এই মানব জন্মের হরিণ শিশুটিকে তুচ্ছ কারণে কি বেদনা দেওয়া যায়।"[৬৪]

যতীনের এরূপ সহানুভূতিতে কুড়ানির প্রতি দুর্বলতা এবং কুড়ানির প্রেমকে সমর্থনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।ফলে কুড়ানি ক্রমশ বালিকা থেকে নারীতে পরিবর্তিত হয়েছে। যতীনকে বকুল ফুলের মালা উপহার দিয়েছে আপন হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা উৎসর্গ করেতে চেয়েছে। কিন্তু যতীন সে মালা ফেলে সবার অগোচরে চলে গিয়েছে। তাঁর এ চলে যাওয়া কুড়ানির কোমল হৃদয়ে এক কঠিন আঘাত হয়ে শূন্যতার বিশাল সুর হিসেবে বেজেছে।

Dhaka University Institutional Repository

"সমস্ত কঠিন প্রহেলিকা। কী হইল,কেন এমন হইল, তার পরে এই প্রভাত, এই গৃহ, এই যাহা কিছু এই সমস্তই এমন একেবারে শূন্য হইয়া গেল কেন।"[৬৫]

এই শূন্যতার মধ্যে আশ্রয়দাতার সান্ত্বনাও তার কাছে ভালো লাগেনি। তাঁর সবকিছু ফেলে অভিমান করে নিজেকে আড়াল করেছে সে। তারপর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে যতীন যখন তাঁর কাছে এসেছে এবং বকুল ফুলের মালা পরিয়ে দিতে বলেছে, তখন কুড়ানি 'কী হবে দাদা বাবু" বলে- পূর্বেকার মালা ফেলে দিয়ে যতীনের অনাদরের জবাব দিয়েছে। মাল্যদানে প্রেমের এই সামান্য টানাপোড়েন ছাড়া আর কোনো সমস্যা বা জটিলতা নেই। দাম্পত্য-জীবনে-প্রেমে এমন মান-অভিমান সেকালের পতি-পত্নীর কাছে সুখকে অনুভব করবার পক্ষে অসংগত মনে হয় না।

১১.দর্পহরণ

'দর্পহরণ'মূলত সাহিত্যানুরাগী স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্মিলনের গল্প। এতে স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে নিত্য ঘটে যাওয়া খুটি-নাটি বিষয়, বিচ্ছেদ, তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি ছাপিয়ে উভয়ের সাহিত্য চর্চার বিষয়টি মূখ্য হয়ে উঠেছে। স্বামী পুরুষটি এ গল্পে কথকের ভূমিকায়। এতে একদিকে স্ত্রীর সাহিত্য চর্চায় সহনশীলতা, মেধা-স্বক্রিয়তা এবং স্বামীর প্রতি গভীর মমত্ববোধ, প্রেম-ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে স্বামীর সাহিত্য চর্চায়- মিথ্যা অহংকার, সূক্ষ্ম ঈর্ষা এবং স্ত্রীর প্রতি প্রেমহীন হিংসাত্বক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। স্ত্রীকে সে কেবল নারী হিসেবে দেখেছে। ফলে স্ত্রী শ্রীমতি নির্ঝরিণী দেবীকে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মানুষের মর্যাদা দানে অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে শ্রী হরিশচন্দ্র হালদারের। এবং ভিতরে ভিতরে সে নারীকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেছে।

"বাবা তাহাকে নির্বিচারে যতই উৎসাহ দিয়াছেন, আমি ততই সতর্কতার সহিত ত্রুটি নির্দেশ করিয়া তাহাকে যথোচিত সংযত করিয়াছি। আমি ইংরাজি বড় বড় লেখকদের লেখা দেখাইয়া অভিভুত করিতে ছাড়ি নাই। সে কোকিলের উপর কি একটা লিখিয়াছিল, আমি কবি শেলির স্কাইলার্ক, ও কীটসের নাইটিঙ্গেল শুনাইয়া তাহাকে একপ্রকার নীরব করিয়া দিয়াছিলাম। তখন বিদ্যার জোরে আমিও যেন শেলি ও কীটসের গৌরবে কতকটা ভাগী হইয়া পড়িতাম। আমার স্ত্রী ইংরেজি সাহিত্য হইতে ভালো ভালো জিনিস তাহাকে তর্জমা করিয়া শুনাইবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিত, আমি গর্বের সহিত তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতাম।...নিশিথে চন্দ্র মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো হইয়া উঠিলে দুই দণ্ড বাহবা দেওয়া চলে, কিন্তু তাহার পরে ভাবিতে হয়, ওটাকে ঢাকা দেওয়া যায় কী উপায়ে।"[৬৬]

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীর সাহিত্যানুরাগকে লোকসমাজে কোনো ভাবেই স্বীকৃতি দিতে চায়নি সে। স্ত্রীর লেখার পাঠক ভক্তদের কাছেও সে দ্বন্দ্বময় মানসিকতা এবং হীনমন্যতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। সহজভাবে স্বামী হিসেবে নয়, স্ত্রীর প্রভু হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতেই তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। তার এ মানসিকতার মধ্য দিয়ে প্রভুত্ববাদী পুরুষের প্রাচীনপন্থী চরিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে তার স্বীকারোক্তিটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

> "আমি তাহার স্বামী কি না, সে কথার জবাব দিতে চাহি না, তবে তিনি আমার স্ত্রী বটেন।'...'বাহিরের লোকের কাছে স্ত্রীর স্বামী বলিয়া খ্যাতিলাভ করা আমি গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি নাই।"...আমার অন্তরাত্মা কহিতে লাগিল আর সব ভালো হইল কিন্তু তোমার বাংলা বিদ্যা সম্বন্ধে তোমার স্ত্রীর মনে এই-যে সংস্কার, এটা ভালো নয়। তিনি নিজেকে মস্ত বিদুষী বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন-কোন্‌দিন বা মশারির মধ্যে নাইট স্কুল তিনি তোমাকে বাংলা পড়াইবার চেষ্টা করিবেন।"[৬৭]

কিন্তু স্ত্রী তার পাছে স্বামীর অপমান হয় এই ভেবে 'প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গসাহিত্য' শীর্ষক ক্লাবের বক্তৃতা থেকে কৌশলে তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে। এখানে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। অথচ স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে সে "লিখিবার যোগ্য কোন লেখা কোনো দেশে কোনোদিন কোনো স্ত্রীলোক লেখে নাই" বলে সমস্ত স্ত্রী জাতিকে হেয় করবার চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সফলকাম হতে পারেনি।

'উদ্দীপনা' পত্রিকায় গল্প রচনা প্রতিযোগীতায় স্ত্রীর কৃতিত্বে তার সমস্ত দর্পচূর্ণ হয়ে গেছে। 'এ নির্ঝরিণী যে আমারই নির্ঝর' তাহাতে সন্দেহ নাই" বলে সে স্ত্রীর প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এর আগেই স্বামীর কাছ থেকে দারুণ অবহেলা সহ্য করতে না পেরে'স্ত্রী লোকের রচনা বলিয়া লোকে মিথ্যা প্রশংসা করে" মনে করে সমস্ত লেখা আগুনে নষ্ট করে ফেলেছে। এবং আর কখনো লিখবেনা বলেও ভিতরে ভিতরে প্রতিজ্ঞা করেছে । গল্পে দাম্পত্য সংসারে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অপ্রেম,হীনমন্যতা থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর গভীর ভলোবাসায় তা বিপরীত মুখী হয়ে সংকট-সমস্যার দিকে দাবিত হয়নি, সম্মিলন ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

১২.হৈমন্তী

'হৈমন্তী''-গল্পটি রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ছোটগল্পগুলির অন্যতম একটি। গল্পের কাহিনীটি হৈমন্তীর স্বামী অপুর জবানীতে উপস্থাপিত হয়েছে।

> ''আমার সঙ্গে যাহার বিবাহ হইয়াছিল তাহার সত্য নামটা দিব না। কারণ, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার নামটি লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিবাদের কোনো আশঙকা নাই। যে তাম্রশাসনে তাহার নাম খোদাই করা আছে সেটা আমার হৃদয়পট। কোন কালে সে পট এবং নাম বিলুপ্ত হইবে এমন কথা আমি মনে করিতে পারি না। কিন্তু যে অমৃতলোকে তাহা অক্ষয় হইয়া রহিল সেখানে ঐতিহাসিকের আনাগোনা নাই।''[৬৮]

'হারদারগোষ্ঠী'র বানোয়ারি লাল স্ত্রী, বংশগৌরব সব কিছুকে ত্যাগ করে আত্মমুক্তির পথ খুঁজেছে, সরব প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু ' হৈমন্তী-গল্পে 'হৈমন্তী' সে ভাবে সরব নয়, সে নিরব। কেবল পিতার অপমানের প্রতিবাদ ছাড়া, আত্মঅবমাননার সমস্ত যন্ত্রণাই সে নিরবে সহ্য করেছে। আর নিরব থাকতে থাকতেই এক সময় নিরবে হারিয়ে গেছে। গল্পটিতে কোমল স্বভাবা লাবণ্যময়ী হৈমন্তীকে যৌতুক প্রথার যুপকাষ্ঠে নির্মমভাবে বলি হতে দেখি আমরা।

কলকাতার নব্যশিক্ষিত যুবক অপু হৈমন্তীকে ভালোবাসতো। স্ত্রীর প্রতি অপুর সেই ভালোবাসা সেকালে অন্যসব সাধারণ পুরুষের তুলনায় একটু বেশিই ছিল। এর কারণ আধুনিক শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও মানসিকতা। এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

> ''দানের মন্ত্রে স্ত্রীকে যেটুকু পাওয়া যায় তাহাতে সংসার চলে, কিন্তু পনের আনা বাকি থাকিয়া যায়। আমার সন্দেহ হয়, অধিকাংশ লোক স্ত্রীকে বিবাহমাত্র করে, পায় না, এবং জানেও না যে পায় নাই; তাহাদের স্ত্রীর কাছেও আমৃত্যুকাল এ খবর ধরা পড়ে না। কিন্তু সে যে আমার সাধনার ধন ছিল, সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।''[৬৯]

স্ত্রী হৈমন্তীকে কেন্দ্র করে অপুর এই মানসিকতা আধুনিক শিক্ষার ফল। নব্য শিক্ষিত যুবক তার আধুনিক মন মানসিকতা ও চিন্তা চেতনা দিয়ে পুরোনো ধ্যান ধারনা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পারেনি, বংশ পরম্পরায় প্রবহমান সংস্কারের কাছে তাকে হেরে যেতে হয়েছে ; কাপুরুষের মত সেও চুপ হয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

"যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল, তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিতেছে আমিও তাহাদের মধ্যে একজন।"[৭০]

স্ত্রীর মনে 'নিঃশব্দ গভীর বেদনার রূপ' প্রত্যক্ষ করে স্বামী হিসেবে অপু তার প্রতিকার করতে পারেনি। যে স্ত্রীকে পেয়ে 'আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম বলে' অপু আত্মতৃপ্ত হয়েছিল, সেই স্ত্রীর মর্মান্তিক অন্তর দহনে সামান্য সান্ত্বনার বাণীও শুনাতে পারেনি। সে বলেছে-'তাহাকে আমি সব দিতে পারি কিন্তু মুক্তি দিতে পারি না'। এ কারণে হৈমন্তী নিজেই চিরমুক্তি নিয়ে নিয়েছে, দূরে সরেছে অপুর কাছ থেকে। রোমান্টিক আবেগ থাকা সত্ত্বেও অপুর ব্যক্তি চরিত্র এ ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য রূপ লাভ করতে পারেনি; সনাতন পদ্ধতির কাছে মার খেয়ে গেছে।

হৃদয়হীন স্বার্থান্ধ শ্বশুর-শাশুড়ির নিষ্ঠুর আচরণে আর তার গুণমুগ্ধ অথচ পৌরুষহীন স্বামীর নিশ্চেষ্ট অসহায়তার মুখে সরলশুভ্র, নিষ্কলঙ্ক সত্যব্রতী এবং একই সঙ্গে সরল তেজস্বিনী হৈমন্তীর বেদনাবিধুর পরিণতি আমাদের মর্মমূলে আঘাত করে। নিত্যান্ত সাধারণ এক পারিবারিক পরিমণ্ডলের অসাধারণ এক ছবি আঁকার দক্ষতা এবং চরিত্র চিত্রণে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি গভীর সহানুভূতি ও অপূর্ব মনোবিশ্লেষণের পরিচয় রয়েছে রবীন্দ্রনাথের, এই আশ্চর্য শিল্পীত ছোটগল্পে।

১২. অপরিচিতা

'অপরিচিতা' (১৩২১) কর্মজীবী নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের গল্প। এই গল্পের নায়িকা 'কল্যাণী' তৎকালের সামাজিকতার ধারায় বয়স, পণের টাকা এবং এর মান- মূল্য বিচারের মধ্য দিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছে। এবং সেই লাঞ্ছনার শোধ নিয়েছেন বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর পিতা শম্ভুনাথবাবু। এ ক্ষেত্রে একেবারে নির্বিকার থেকেছে গল্পের নায়ক। তার এই নিষ্ক্রিয়তার মূল কারণ দূর্বল ব্যক্তিত্ব, মানসিকতা।

'হৈমন্তী' (১৯১৪) গল্পের 'অপু'র সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ করা যাবে এ গল্পের নায়ক অনুপম চরিত্রের। আমরা দেখি যে এরা দু'জনেই অভিভাবকের আদেশকে বিচার বিবেচনা না করে অন্যায় কর্মকেও শিরোধার্য বলে মনে করে। শিক্ষার দিক থেকে অপুর চেয়ে অনুপম অধিকতর শিক্ষিত-এম. এ. পাস। কিন্তু তা হলে হবে কি অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করবার সাহসের অভাব তারও। কারণ তার মানস গঠনে যে দু'জনের ভূমিকা আমরা এ গল্পে দেখেছি,তাতে আর যাই হোক অনুপমের ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোনো সুযোগ নেই। এ বিষয়ে অনুপমের নিজের স্বীকার উক্তিটি উল্লেখ করা যেতে পারে-

Dhaka University Institutional Repository

'মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে-বস্তুত, না-মানিবার ক্ষমতা আমার নাই'। .....অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি। 'আমার আসল অভিভাবক আমার মামা।... যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্য দেবতার প্রধান এজেন্ট'।[৭১]

'অনুপম-এর সমস্ত আশ্রয় এই দুই চরিত্র মা ও মামা। এ দু'জনের মর্জি মাফিক চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্তই তার সমস্ত জীবনের সিদ্ধান্ত হয়ে উঠেছে। এর পেছনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে তার বেকারত্ব; অলস কর্মহীন জীবন সম্পর্কে সে নিজেই বলেছে–

'কিছুদিন পূর্বেই এম.এ.পাস করিয়াছি। সামনে যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধু-ধু করিতেছে, পরীক্ষা নাই, উমেদারি নাই, চাকরি নাই, নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।[৭২]

অনুপমের এমন ব্যক্তিত্বহীনতার বিপরীতে অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে 'কল্যাণী' নারী চরিত্রটি। সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উল্লেখ না থাকলেও বাংলা ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার ব্যবহারে সুশিক্ষার পরিচয় দিয়েছে সে। তাঁর বাচনভঙ্গি, উদার মানসিকতা একজনকে সহজে মুগ্ধ করবার পক্ষে অনেকখানি; অনুপমও হয়েছিল। কল্যাণী তার 'মনের মধ্যে একটি অখণ্ড আনন্দের ছবি' হয়ে বিরাজ করেছে।

'মেয়েটির বয়স ষোল কি সতের হইবে' কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুকুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোন জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।..... মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে।"[৭৩]

কল্যাণীকে কেবল সৌন্দর্যময়ী নারী নয়, একজন সত্যিকার মানুষ বলে মনে হয়েছে। তাঁর আহবানের মধ্যে প্রগাঢ় প্রশান্তি অনুভব করেছে অনুপম।

'মনে হইল, যেন গান শুনিলাম। বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কী মধুর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচম্‌কা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়া চলেনা, এ কেবল একটি মানুষের গলা; শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে, 'এমন তো আর শুনি নাই।'[৭৪]

গল্পের শেষে আমরা নায়কের মধ্যে এক ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ জাগ্রত হতে দেখেছি। কিন্তু তা তার ব্যক্তিত্বহীনতার উপর ছায়া ফেলার মতো নয়, কেবল বেদনাদায়ক, স্মৃতি রোমন্থনের উপায় মাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. শেষের রাত্রি

দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে নিঃসঙ্গতার গল্প 'শেষের রাত্রি'। এ গল্পে নারীর প্রতি পুরুষের আকাঙ্খা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু নারীর পক্ষ থেকে তাতে সারা মেলেনি। ফলে স্বামী-স্ত্রীর দু'জনের মিল অমিলের মধ্যে দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে তাদের দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতা। অসম বয়সের বিবাহ গল্পেটির দাম্পত্য সংকটের মূল কারণ। গল্পগুচ্ছের অনেক গল্পেই এ সমস্যা আছে। গল্পের নায়ক যতীন শারীরিকভাবে অসুস্থত। তাঁর এ অসুস্থতা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 'মানসিক চলাচলের'। ফলে মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীকে ফেলে ছোট বোনের অন্নপ্রাশনে যাবার আয়োজন করছে সে। 'চঞ্চলমতি সুখ পরায়ণ বালিকা' মনির পক্ষে এমন উদাসীনতা অস্বাভাবিক রকম কিছু নয়। এ বিষয়ে সে তার সখিকে বলেছে-

> "তা আমি ভাই, তোমাদের মতো লোক-দেখানে ভান করতে পারি নে। পাছে কেউ কিছু মনে করে ব'লে মুখ গুঁজড়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকা আমার কর্ম নয়।"[৭৫]

কিন্তু যতীন বয়সের স্বাভাবিকতায় প্রাজ্ঞ বলে এত কিছু মনে করেনি। সে মণির উদাসীনতায় তার ওপর কখনো রাগও করেনি। বরং 'মন তো মাটির ঢেলা নয়, কুড়িয়ে নিলেই তো নেওয়া যায় না। 'আমি জানতুম, মনি নিজের মন এখনো বোঝেনি,' বলে স্ত্রীর সমস্ত অবহেলাকে সহানুভূতিশীল হৃদয় দিয়ে

বিচার করেছে। স্ত্রীর কোমল হাতের স্পর্শ পেতে তীর্থের কাকের মতো প্রতীক্ষা করেছে সে। মাসির কাছে প্রতিনিয়ত মনির সমস্ত অবহেলাকে ছেলে মানুষি বলে , তার মানসিক ক্রমোন্নতির স্বপ্ন দেখেছে। মাসি যতীনকে পরম স্নেহে, তাকে খুশি করবার জন্য তাতে সায় দিয়েছে, মনির পক্ষ নিয়ে মিথ্যা বলেছে। যতীনের দাম্পত্য অসুখের শোকে অস্থির হয়েছে সে।

> 'কতদিন তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, যতীন বারান্দায় আসিয়া রাত কাটাইয়াছে, বৃষ্টির ছাঁট আসিয়াছে তবু ও ঘরে যায় নাই। কতদিন সে মাথা ধরিয়া বিছানায় পড়িয়া ; একান্ত ইচ্ছা, মণি আসিয়া মাথায় একটু হাত বুলাইয়া দেয়। মণি তখন সখীদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া থিয়েটার দেখিতে যাইবার আয়োজন করিতেছে।"[৭৬]

মনি-যতীনের দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল বিপরীতমুখী। নিঃসঙ্গ যন্ত্রণায় কাতর যতীনের কাছে সন্ধ্যার পর থেকেই মনে হয়েছে দুপুর রাত শুরু গেছে। মনের মিল না হওয়াতে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের যে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে তা দুঃখজনক এবং মর্মান্তিক। গল্পে স্বামী পুরুষের পক্ষ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

যত সহনশীল আচরণ আছে, তাতে স্ত্রীর পক্ষ থেকে ইঙ্গিত মাত্রও নেই। 'দুই যন্ত্র দুই সুরে বাঁধা, এক সঙ্গে আলাপ চলা বড়ো কঠিন।"[৭৭]

স্ত্রীর জন্য যতীনের সমস্ত ব্যাকুলতা শেষে তার কল্পনায় স্বপ্ন হিসাবে প্রতীকায়িত হয়ে উঠেছে-

> "অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া যতীন দেখিতেছিল, তাহার মণিই আজ মৃত্যুর বেশ ধরিয়া আসিয়া দাড়াঁইয়াছে। সে আজ অক্ষয় যৌবনে পূর্ণ-সে গৃহিণী, সে জননী, সে রূপসী, সে কল্যাণী।"[৭৮]

যতীনের এ স্বপ্ন সফল হয়নি, স্বপ্নই থেকে গেছে। বরং দাম্পত্য বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় তার অবচেতন মনে জন্ম নেয় অন্য এক অনুভূতির যা তাকে মানসিক বিকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

> "সে স্বপ্ন দেখছিল মণি যেন দরজা ঠেলে তার ঘরে আসতে চাইছে, কিন্তু কোন মতেই দরজা এতটুকুর বেশী ফাঁক হলো না, সে বাইরে দাড়িয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই ঢুকতে পারলনা, মণি চিরকাল আামার ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়েই রইল।"[৭৯]

মণির সঙ্গে 'মধ্যবর্তিনী' গল্পের শৈলবালা'র বেশ মিল আছে। তা সত্ত্বেও এটি নতুন মাত্রা পেয়েছে, বিশ্বযুদ্ধোত্তর গল্পের অনিবার্য অনুসঙ্গ হিসেবে।

১৪.তপস্বিনী

'তপস্বিনী' (১৩২৪) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'ষোড়শী'। তার অসম দাম্পত্য জীবনের নিঃসঙ্গতা, জৈবিকঃ অতৃপ্তিজনিত হৃদয়-বেদনা এবং সংসার দাম্পত্যের নানা কিছু থেকে বঞ্চিত-জীবনের যন্ত্রণা স্থান পেয়েছে এতে। গল্পের সমাপ্তিতে সূক্ষ্ম হাস্যরস আছে, যা নারীর হৃদয় বেদনাকে আরও করুণরসে আচ্ছন্ন করে তুলেছে।

তিনবার বি.এ ফেল করে স্বামীর গৃহ ত্যাগের সময়র স্ত্রী ষোড়শীর বয়স তের বছর। এই অপরিণত বয়সের উল্লেখ ছাড়া তাদের দাম্পত্য-সংসারের অন্য কোনো বর্ণনা নেই গল্পে। কিন্তু বয়সের পার্থক্যের কারণে ষোড়শীকে মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলার মতো অনেক প্রসঙ্গ আছে। 'তার সামনেই বরদার চরিত্র সমালোচনায় বাড়ির দাসীগুলোর পর্যন্ত বাধিত না।' বয়সের পরিক্কতা না এলেও ষোড়শী স্বামীর অপমানে যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছে। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ সে করতে পারেনি। ফলে স্বামী ঘর ছেড়ে যাওয়াতে এক ধরণের স্বস্তিবোধ করেছে সে। 'তার স্বামী যে পবিত্রতার আদর্শ ছিল এবং সংসারশুদ্ধ সকলেই তার প্রতি অন্যায় করিয়াছে, সকল দুঃখের মধ্যে এই সান্ত্বনায়, এই গৌরবে ষোড়শীর মন

Dhaka University Institutional Repository

ভরিয়া উঠিতে লাগিল।"[৮০] কিন্তু এই সান্ত্বনা এক সময় ম্লান হয়ে আসে ষোড়শীর বয়সের আবেদনের ফলে। ধীরে ধীরে সে অনুভব করতে পারে স্বামীর বিচ্ছেদ কী বিশাল শূন্যতা। এ শূন্যতা তাকে প্রচণ্ড একা করে দেয়।

> "ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া যখন তখন তার চোখ জলে ভরিয়া আসে। চিরপরিচিত সংসারটা তাকে চারি দিকে যেন আঁটিয়া ধরে, তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে। তার ঘরের প্রত্যেক জিনিসটা, তার বারান্দার প্রত্যেক রেলিঙটা, আলিসার উপর যে কয়টা ফুলের গাছের টব চিরকাল ধরিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে, তারা সকলেই যেন অন্তরে অন্তরে তাকে বিরক্ত করিতে থাকিত। পদে পদে ঘরের খাটটা, আল্‌নাটা, আলমারিটা-তার জীবনের শূন্যতাকে বিস্তারিত করিয়া ব্যাখ্যা করে; সমস্ত জিনিসপত্রের ওপর তার রাগ হইতে থাকে।...সংসারে তার একমাত্র আরামের জায়গা ছিল ঐ জানালার কাছটা। যে বিশ্বটা তার বাহিরে সেইটেই ছিল তার সবচেয়ে আপন। কেননা, তার 'ঘর হইল বাহির, বাহির হইল ঘর"।[৮১]

স্বামী গৃহে স্বামীহীন এই একাকিত্বের যন্ত্রণা, অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে ষোড়শী। কিন্তু পারেনি, তার আপন ভুবনে আপন হয়ে উঠেনি। বিপরীতক্রমে বিরহ যাতনা বেড়েছে। অসহ্য যাতনা নিয়ে সে প্রহর গুনেছে। তার অন্তরে যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে -"সহেনা যাতনা/দিবস গনিয়া গনিয়া বিরলে/নিশিদিন বসে আছি শুধু পথপানে চেয়ে/সখাহে এলেনা"[৮২] কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বামী ফিরে না আসায় ষোড়শী মাসসিক বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। প্রথম দিকে- সন্ন্যাসী সেবা, কৃচ্ছসাধন চর্চা ইত্যাদির মধ্যে স্বামী-সুখ পাবার বিকল্প চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত জৈবিক অচরিতার্থতাজনিত হাহাকারকে বশে রাখতে পারেনি সে।

> "কিন্তু ষোড়শী যে নিজের মন জানিত। তার মনের রঙ তো তার গায়ের তসরের রঙের মতো সম্পূর্ণ গেরুয়া হইয়া উঠিতে পারে নাই। আজ ভোর বেলাটাতে ঐ-যে ঝির্ ঝির্ করিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছিল, সেটা যেন তার সমস্ত দেহমনের উপর কোন একজনের কানে কানে কথার মতো আসিয়া পৌঁছল। ...এক-একদিন তার সমস্ত মন যেন অতিচেতন হইয়া ওঠে, রৌদ্রে নারিকেলের পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্ করে সে যেন তার বুকের মধ্যে কথা কহিতে থাকে। পণ্ডিত মশায় গীতা পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেটা ব্যর্থ হইয়া যায়; অথচ সেই সময়ে তার জানালার বাহিরের বাগানে শুকনো পাতার উপর দিয়া যখন কাঠবিড়ালি খস্ খস্ করিয়া গেল, বহুদুর আকাশের হৃদয় ভেদ করিয়া চিলের একটা তীক্ষ্ণ ডাক আসিয়া পৌঁছিল, ক্ষণে ক্ষণে পুকুর

Dhaka University Institutional Repository

> পাড়ের রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার একটা ক্লান্ত শব্দ বাতাসকে আবিষ্ট করিল, এই-সমস্তই তার মনকে স্পর্শ করিয়া অকারণে ব্যাকুল করে। এ'কে তো কিছুতেই বৈরাগ্যের লক্ষণ বলা যায় না।"[৮৩]

স্বামীর জন্য দীর্ঘ প্রতিক্ষার কারণে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা দেখা দেয় ষোড়শীর। অচরিতার্থতায় আরও ব্যাকুল হয়ে উঠে সে। এবং শ্বশুরের সম্পত্তি, নিজের গহনা দান করে সন্ন্যাসী-সভ্যদের পথ অনুসরণ করতে শুরু করে। এক পর্যায়ে পুরোপুরি মানসিক বিকারগ্রস্ততায় 'হ্যালুসিনেশন' হয় তার মধ্যে। তাই যোগী শিক্ষকের কথায় আয়নার মধ্যে তার স্বামীর অবস্থান প্রত্যক্ষ করে সে।

কিন্তু 'গল্পেরশেষে যোগী শিক্ষকের এসকল মিথ্যা ফাঁস হয়েছে আমেরিকার কাপড় কাচা কল কোম্পানীর ভ্রমণকারী এজেন্ট হয়ে ষোড়শীর স্বামীর আগমনের মধ্য দিয়ে। আবির্ভূত হয়ে হাস্যরস কিন্তু তপস্বিনী স্ত্রীর তপস্যার নেপথ্যে যে না পাওয়ার হাহাকার, বঞ্চনা আমরা লক্ষ করি, তা, এ গল্পের হাস্যরসকে আড়াল করে দিয়ে সংসার-জীবনে বঞ্চিত এক নারীর হৃদয় বেদনার আলেখ্য স্পষ্ট করে তুলে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, প্রথম প্রকাশ–১৩৩৩, কলিকাতা,পৃষ্ঠা -৭০

২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭০।

৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭০।

৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৪।

৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৭।

৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৪।

৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৭।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – পরশ পাথর (কবিতা) *সঞ্চয়িতা*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা – ৫৪

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – মানস সুন্দরী (কবিতা) *সঞ্চয়িতা*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা – ৬৩

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, প্রথম প্রকাশ–১৩৩৩, কলিকাতা,পৃষ্ঠা -১৪৮

১১. আনোয়ার পাশা : *রবীন্দ্র ছোট গল্প সমীক্ষা*, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ভাদ্র, ১৩৭৬ পৃষ্ঠা–১৯।

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, প্রথম প্রকাশ–১৩৩৩, কলিকাতা,পৃষ্ঠা -১৫১

১৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫১।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫২।

১৫. ক্ষেত্রগুপ্ত – *রবীন্দ্র গল্পঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ*, গ্রন্থনিলয়, অগাস্ট, ১৯৯১, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৫৭।

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, প্রথম প্রকাশ–১৩৩৩, কলিকাতা,পৃষ্ঠা -১৫৩

১৭. আনোয়ার পাশা : *রবীন্দ্র ছোট গল্প সমীক্ষা*, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ভাদ্র, ১৩৭৬ পৃষ্ঠা–৩৯।

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, প্রথম প্রকাশ–১৩৩৩, কলিকাতা,পৃষ্ঠা -৭৮

১৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৮।

২০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৯।

২১ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮০।

২২. ক্ষেত্রগুপ্ত – *রবীন্দ্র গল্পঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ*, গ্রন্থনিলয়, অগাস্ট, ১৯৯১, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৩২, ৩৩।

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, প্রথম প্রকাশ–১৩৩৩, কলিকাতা,পৃষ্ঠা -৮২

২৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮২।

২৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৩।

২৬. ক্ষেত্রগুপ্ত – *রবীন্দ্র গল্পঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ*, গ্রন্থনিলয়, অগাস্ট, ১৯৯১, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, প্রথম প্রকাশ–১৩৩৩, কলিকাতা,পৃষ্ঠা -১৬৬।

২৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৫।

২৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৬।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৬।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৭।

৩২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৮।

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৮।

৩৪. নজরুল কবির-*রবীন্দ্র ছায়াবৃক্ষের ছায়াতলে*, লিড ফেয়ার, ঢাকা, ২০০৬; পৃষ্ঠা- ১৩।

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, প্রথম প্রকাশ–১৩৩৩, কলিকাতা,পৃষ্ঠা -১৭০।

৩৬. ক্ষেত্রগুপ্ত – *রবীন্দ্র গল্পঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ*, গ্রন্থনিলয়, অগাস্ট, ১৯৯১, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৫৯-৬০।

৩৭. আনোয়ার পাশা : *রবীন্দ্র ছোট গল্প সমীক্ষা*, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ভাদ্র, ১৩৭৬ পৃষ্ঠা–২০।

৩৮. আনোয়ার পাশা : *রবীন্দ্র ছোট গল্প সমীক্ষা*, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ভাদ্র, ১৩৭৬ পৃষ্ঠা–২২।

৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, প্রথম প্রকাশ–১৩৩৩, কলিকাতা,পৃষ্ঠা -১৯৫।

৪০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২০৯।

৪১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৫।

৪২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৮।

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৯।

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২০০।

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২০০।

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২০৬-২০৭।

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৮।

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৩।

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৪।

৫০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৬।

৫১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৭।

৫২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৭৬।

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮১।

Dhaka University Institutional Repository

৫৪. আনোয়ার পাশা : *রবীন্দ্র ছোট গল্প সমীক্ষা*, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ভাদ্র, ১৩৭৬ পৃষ্ঠা–৬১।

৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, প্রথম প্রকাশ–১৩৩৩, কলিকাতা,পৃষ্ঠা -৪২০।

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪১১।

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪১৩।

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪১৫।

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪২১।

৬০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪২১।

৬১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪২১।

৬২. আনোয়ার পাশা : *রবীন্দ্র ছোট গল্প সমীক্ষা*, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ভাদ্র, ১৩৭৬ পৃষ্ঠা–৭২।

৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, প্রথম প্রকাশ–১৩৩৩, কলিকাতা,পৃষ্ঠা -৫০৬।

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫১০।

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫১০।

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৯৯।

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫০০-৫০১।

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৪৭-৬৪৮।

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫১।

৭০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৫৭।

৭১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭০৭।

৭২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭০৮।

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭১৫।

৭৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭১৪।

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৯৫।

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৯৬।

৭৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৯৮।

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭০০।

৭৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭০৪।

৮০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭২৩।

Dhaka University Institutional Repository

৮১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭২৩।

৮২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *গীতবিতান*, লিপিকা, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৪৯৪।

৮৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, প্রথম প্রকাশ–১৩৩৩, কলিকাতা,পৃষ্ঠা -৭২৫।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র ছোটগল্পে রূপায়িত দাম্পত্য জীবনসংকট

বাংলা ভাষাতে ছোটগল্প সার্থক রসরূপ লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমেই। কিন্তু সসময়ে তাঁর সব উপন্যাস ও ছোটগল্প সবশ্রেণীর পাঠকের সমাদর পায়নি। তার কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প উপন্যাসে নিতান্ত পল্লী বাংলার কেবল সামাজিক চিত্রের প্রতিফলন ঘটাননি; তাঁর কথাসাহিত্যের চরিত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রেই তথাকথিত সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, সেই জন্যই 'চোখের বালি'র বিনোদিনী, 'চতুরঙ্গ'র দামিনী, যোগাযোগ'র কুমু, শেষের কবিতা'র অমিত- লাবন্য, কিংবা নষ্টনীড় 'র - চারুলতা, স্ত্রীর পত্র'র মৃনাল অথবা পয়লা নম্বর'র- অনিলাকে সাধারণ পাঠক সমাজ নিতে পারেনি। এই চরিত্রগুলি সৃষ্টির জন্য সমালোচকদের অনেক অপ্রিয় কথা হজম করতে হয়েছিল তাকে। রবীন্দ্রনাথ বোধহয় খেয়াল করতে চাননি যে আমজনতা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সামাজিক বিপ্লব প্রত্যক্ষ করতে চায়না, বরং তারা দেখতে চায় ভাল মন্দ কুসংস্কার আর রীতিনীতিতে আচ্ছন্ন তাদের দৈনন্দিন সমাজ ও সামাজিক চরিত্রগুলিকে। তাই আমরা দেখি যে, পারিবারিক জীবনের ঘরোয়া কাহিনী যে গল্পগুলিতে রূপ পেয়েছে তাতে লেখক বাঙালি জীবনের সহজ নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার মধ্যেই স্বচ্ছন্দ তুলির স্বল্প আঁচড়ে এক একটি সরল ব্যক্তিত্বকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বস্তুতঃ আমাদেরই চারপাশে বিরাজমান এই সকল নর-নারী আমাদের একান্ত চেনা-জানার মধ্যে থেকেও যেন আমাদের অজানা ছিল। গল্পগুলির মধ্য দিয়ে তাদের সঙ্গে নতুন করে পরিচয়ে যেন মুগ্ধ হই আমরা। রাম কানাইয়ের মতো সরল সত্য হৃদয় ব্যক্তিত্ব, যজ্ঞনাথের মতো কৃপণ গ্রাম্য মহাজন, বৈদ্যনাথের মতো নিরীহ স্বল্পে তুষ্ট বাঙালি, মোক্ষদার মতো গৃহিনী, চন্দরার মতো বধূ এরা সকলেই আমাদের অদ্যাবধি পরিচিত গ্রাম বাংলার চিরচেনা নরনারী, যা আশ্চর্য সফলতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে গল্পে ।

সেকালের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা- বাল্যবিবাহ, অসমবিবাহ, পণপ্রথা, সহমরণ প্রথা, বর্ণবৈষম্য, অর্থলিপ্সা, হিংসা-প্রতিহিংসা ইত্যাদি পটভূমি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গল্পের । ফলে তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিভিন্ন সংকটের বাস্তবানুগ চিত্র। এর মধ্যে চরিত্রের সংকট, পারিবারিক সংকট এবং সামাজিক সংকটই মুখ্য। এবং নানা টানাপোড়েনে- নষ্ট হয়েছে দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক সুখ শান্তি। অত্যন্ত দরদ দিয়ে প্রকৃতি সংলগ্ন করে, এসব ঘটনার শুদ্ধ, সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যমে আমাদেরকে আকৃষ্ট করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের মন ও মননের সুস্থতার পথ নির্মাণে প্রয়াস পেয়েছেন। সেই গল্পগুলো থেকে– পারিবারিক জীবন, সমাজ-পরিবেশ, অন্ধ সংস্কার, ও সমাজসমস্যামূলক কয়েকটি গল্প নিয়ে এই অধ্যায়ে উল্লিখিত বিষয়টির আলোচনা করা যেতে পারে। গল্পগুচ্ছে'র দাম্পত্য সমস্যা সংকট সমৃদ্ধ গল্পের মধ্যে আমরা–'দেনা পাওনা '(১২৯৮),'দান প্রতিদান' (১২৯৯),'জীবিত ও মৃত' (১২৯৯),

Dhaka University Institutional Repository

শাস্তি (১৩০০), খাতা, মেঘ ও রৌদ্র (১৩০১), প্রায়শ্চিত্ত (১৩০১), বিচারক (১৩০১), নিশীথে (১৩০১), মানভঞ্জন (১৩০২), মনিহারা (১৩০৫), উদ্ধার (১৩০৫),নষ্টনীড় (১৩০৮), স্ত্রীর পত্র (১৩২১), পয়লা নম্বও (১৩২৪), দিদি (১২৮১) প্রভৃতির নাম করতে পারি।

নারীর অধিকার সচেতনতা, আত্মমর্যাদাবোধ, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মূল্য ও মর্যাদার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয় আলো এসে পড়েছে এই গল্পগুলিতে। এগুলোতে নারীর সামাজিক অবস্থানসহ তাঁর দাম্পত্য সংকট ও সংকটের কারণ,সমস্যা জটিলতা অত্যন্ত মার্জিত ভাব ও ভাষায় শিল্পিতভাবে পরিবেশিত হয়েছে। এবং অপরিহার্য পাত্র-পাত্রীর সমন্বয়ে তা বিন্যস্ত হয়েছে। বিষয়টি এই অধ্যায়ে কয়েকটি গল্পের গল্পকেন্দ্রিক আলোচনায় স্পষ্ট করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং তা নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবন সম্পর্ককে আশ্রয় করে স্থিতি ও বিস্তৃতি লাভ করেছে।

নারীর সামাজিক অবস্থার জন্য কখনো কখনো নারীরা নিজেরাই দায়ী। বেগম রোকেয়া যাকে 'মানসিক দাসত্ব' বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রায়শ্চিত্ত, দৃষ্টিদান এ ধরণের গল্প। এগুলোতে অতি পতিভক্তির কারণে দাম্পত্য সংকট সৃষ্টি হয়েছে। নারীর জন্ম পুরুষের দাসত্ব করার জন্য এমন সব সেকেলে ধারণা তাদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল।

সংসার জীবনে নানা বিরোধের মধ্যে সম্পতির অধিকারকে কেন্দ্র করে অনেক সময় দাম্পত্য কলহ দেখা দেয়। সেই বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের সজাগ দৃষ্টি কিছু কম ছিল না। এরকম বিষয় সম্পত্তি বিরোধের গল্প 'দান প্রতিদান'।'ত্যাগ' গল্পে দ্বন্দ্ব সংকটের মধ্য দিয়ে আধুনিক জীবনবোধকে প্রবাহিত করবার চেষ্টা করবার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'আমি জাত মানি না' হেমন্তর এই কথার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিমানুষের মূল্যবোধ সম্পর্কে যে চেতনা প্রকাশ পেয়েছে তা সেকালের যুগচেনার স্বাক্ষর বহন করে। সেকালে এ গল্পের বাইরে অনুরূপ একটা ঘটনা ঘটেছিল বিচারালয়ে। ডিরোজিও'র এক শিষ্য রসিককৃষ্ণ মল্লিককে গঙ্গাজল নিয়ে শপথ করতে বললে তিনি তা না নাকচ করে দিয়েছিলেন- "আমি গঙ্গা মানি না" বলে।

যুগযন্ত্রণায় অস্থির মানুষের মনোবিকার বা মনস্তাত্ত্বিক নানা দিক নিয়ে বিশ্লেষণ আছে রবীন্দ্র সাহিত্যে। তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত, নিশীথে, মনিহারা, প্রভৃতি গল্পে সত্যতা আছে।

নারীর মূল্য সম্পর্কে প্রাচীন মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে-'সম্পত্তি সমর্পণ' ও 'শাস্তি' গল্পে। স্ত্রীর চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রশ্নে বাপের সঙ্গে বৃন্দাবন কুণ্ডের বিচ্ছেদের পর পাড়া প্রতিবেশীরা তাঁকে নিন্দা করে বলেছিল- "সামান্য একটা বউয়ের জন্য বাপের সহিত বিবাদ করা কেবল একালেই সম্ভব । .... একটা বউ গেলে অনতিবিলম্বে আর একটা বউ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু বাপ গেলে দ্বিতীয় বাপ মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যায় না।" এই গ্রামবাসীদের মত একি রকম কথা বলেছে 'শাস্তি' গল্পে ছিদাম রুই-"বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।" ভাইয়ের অপরাধ বউয়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে ছিদাম ভাইকে রক্ষা করতে চায়। কিন্তু মানবিক বিচারে নারীর মূল্য সম্পর্কে সেকালের এইসব মনোভাব

Dhaka University Institutional Repository

মোটেও সুখের ছিল না। কিন্তু পরবর্তী কালে ইংরেজ রাজত্বের অবসানান্তে রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রমুখ মনীষীদের চেষ্টায় আন্দোলনে নারীর মর্যাদা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে সমাজে। 'শাস্তি' গল্পের চন্দরার মধ্যে নারীর এই সচেতনতাকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। চন্দরা এখানে চরম এক প্রতিবাদ স্বার্থপর পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধে।স্বেচ্ছায় ফাঁসি বরণ করে নেওয়াটাও তাঁর একটা বিদ্রোহ,বিদ্রোহ স্বামীর মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে, এবং সেই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী সমাজ প্রভাবকের বিরুদ্ধে। নিরুপমাতে যে জিজ্ঞাসা ছিলো চন্দরাতে তাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চন্দরার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য নারীর অধিকার, স্বাধীনতার ও মুক্তির আকুতিকে মর্যাদার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

আরও পরে চন্দরার নতুন সংস্করণ পাই আমরা 'মানভঞ্জন'গল্পের গিরিবালার মধ্যে। গিরিবালা অপমানিত নারীত্বের মর্যাদার খুঁজে বর্হিমুখী। পারিবারিক জীবনের চৌহদ্দির বাইরে এসে গিরিবালা মুক্তির আলোয় আলোকিত হতে চেয়েছে; গোপিকানাথকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করেছে। তাঁর এ কটাক্ষ নির্যাতিত সমস্ত নারী সমাজের পক্ষ থেকে নির্যাতনকারী শ্রেণীচক্রের প্রতি কটাক্ষ, পুরনো মধ্যযুগীয় আচার, আচরণ ও বিশ্বাসের প্রতি নতুন জীবনবোধের কটাক্ষ। গিরিবালার এই আচরণের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের আদর্শ ও বিশ্বাসে প্রচণ্ডরূপে ঝাঁকি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। অন্তঃপুরে কঠোর শাসনে বন্দিনী এবং অবহেলিত নারী পূর্ণ মর্যাদায় আত্ম প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে। তাই ''সমস্ত কলিকাতা শহরের দর্শক দুই চক্ষু ভরিয়া গিরিবালার অভিনয় দেখিতে লাগিল, কেবল গোপীনাথ সেখানে স্থান পাইল না।''

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবমূল্যায়নের দিকটি নিয়ে বেশকিছু আছে, যেমন-'বিচারক', 'স্ত্রীরপত্র', 'পয়লা নম্বর', দর্পহরণ, খাতা প্রভৃতি। এগুলোতে নারীর মূল্য ও মর্যাদার দিকটি আলোচিত হয়েছে। 'মানভঞ্জন'গল্পের গিরিবালার মতো আত্মমর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেয়েছে 'দিদি' গল্পের শশীকলা । কিন্তু গিরিবালার মত স্বামীর বিরুদ্ধে যেতে পারেনি। দাম্পত্য সম্পর্কের পথে বিচ্ছেদ রেখা টেনে কেবল জীবনের দূরত্ব কমিয়েছে,আত্ম প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। কিন্তু পূর্ণগৌরবে বাঁচার চেষ্টা করেছে 'গৌরী' 'উদ্ধার' গল্পে। গৈরিক বসনের আড়ালে ঔৎ পেতে থাকা এক ক্ষুধার্ত হিংস্র পশুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে সে।

নারীর ব্যক্তিত্বের এ ধরণের চেতনার ব্যতিক্রম হচ্ছে 'প্রায়শ্চিত্তে'র বিন্ধ্যবাসিনী, 'দৃষ্টিদানের কুমুদিনী। এরা পতিদেবতার জীবনের সঙ্গে থাকতে পারার মধ্যেই জীবনের সবটুকু গৌরব মনে করেছেন, তাঁকে ধ্যানের বস্তু মনে করেছেন। কিন্তু দেব-দেবী হিসেবে নয়, তাদের স্বামী-স্ত্রীর মিলন সার্থক হয়েছে মানব-মানবীর স্তরে নেমে আসবার পরে। কারণ কালের পালে তখন মানব-মাহাত্ম্যের হাওয়া লেগেছে, রামকে অতিক্রম করতে শুরু করেছে রাবণ। এই মানব-মাহাত্ম্যের জয়গান আছে 'প্রতিবেশিনী' গল্পে। এখানে ধর্মীয় আচারনিষ্ঠা অপেক্ষা অনেক বেশি মূল্য পেয়েছে একটি বিধবার চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি।

Dhaka University Institutional Repository

যুগসচেতন মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই তাঁর শিল্পের প্রধান বস্তু করেছেন মানুষ। ধর্মীয় আচারনিষ্ঠা অপেক্ষা মানুষের জীবন অনেক বেশি মূল্য পেয়েছে তাঁর কাছে। এমন কি পশুর জীবনও তাঁর কাছে তুচ্ছ নয়, তথাকথিত আচারনিষ্ঠার চেয়ে। 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পে জয়কালীর মন্দিরে নিকৃষ্ট শূকরের জীবনপ্রীতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১.দেনা - পাওনা

দেনা-পাওনা (১২৯৮) মূখ্যত সমাজ সমস্যামূলক গল্প। পণপ্রথার অমানবিক নৃশংসতা-নিরীহ নারীর জীবন কী যন্ত্রণাময় করে তোলে, তারই সকরুণ চিত্র-এ গল্প। এতে একদিকে পিতার গভীর কন্যাপ্রীতি অন্যদিকে শ্বাশুড়ীর নির্মম বধু নির্যাতন, একদিকে রায়বাহাদুরের তথাকথিত খ্যাতির মোহে অপব্যয়, অন্যদিকে অবহেলায় চিকিৎসাহীন নিরুপমার মৃত্যুর কাহিনী সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। গল্পটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক ছোটগল্প হিসাবে ধরা হয়। গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি-'দশ হাজার টাকা পণ' আর বহুল দান সামগ্রী দাবী সত্ত্বেও বনেদী রায়বাহাদুরে পরিবারে কন্যা দান করতে সম্মত হন দরিদ্র রামসুন্দর । কিন্তু টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করতে চান না রায়বাহাদুর। ফলে অন্তঃপুরে কান্না শুরু হয় বিপদের। এই গুরুতর বিপদের মূল কারণ 'নিরুপমা'। "সে চেলি পরিয়া, গহনা পরিয়া, কপালে চন্দন লেপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে।"[১]

তখন হঠাৎ অবাধ্য হতে দেখি বিয়ে করতে আসা বরকে। সে কথিত শ্রাস্ত্রশিক্ষা ও নীতি শিক্ষাকে পদদলে দলিত করে এগিয়ে আসে সামনে। পিতা রায়বাহাদুরকে সে জানিয়ে দেয়- "কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না; বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব।"[২] পণের টাকা পাওনা রেখে এক প্রকার নিরানন্দভাবে বিয়ে হয় নিরুপমার। এবং পণের দেনা'র আশংকায় 'তারা কি আর আমাকে আসতে দেবে না বাবা'। বলে, শ্বশুরালয়ের দিকে পা বাড়ায় সে। অশ্রুসিক্ত রামসুন্দর কন্যাকে বিদায় দেবার বেলা, তাকে নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিলেও বেহাই বাড়ীতে তাঁর কোনো সম্মান, সমাদর প্রতিপত্তি আমাদের চোখে পড়ে না। আমরা দেখি যে, "চাকরগুলো পর্যন্ত তাঁহাকে নিচু নজরে দেখে। -- নিজের কন্যার উপর পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে।"[৩] পণের তখন এমনিই প্রতাপ যে, সেটা ঠিকমতো পরিশোধ করতে না পারার জন্য রামসুন্দর তার কন্যাকে চোখে দেখার হুকুমটি পর্যন্ত সব সময় পেতনা, তাকে "কন্যার দর্শন সেও অতি সসংকোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময়বিশেষে নিরাশ হইলে দ্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকেনা।"[৪]

ফলে গল্পে নিরুপমার 'দাম্পত্য জীবন' শ্বশুরবাড়ি শরশয্যা হয়ে উঠে। মা, বলে সম্ভোধন করলেও মাতৃসুলভ কোন আচরণ নিরুপমা পায়না শাশুড়ীর কাছে। বাপেরবাড়ি নানা বিষয় নিয়ে সে তাকে খোটা দেয়। 'বাপ যদি পুরা দাম দিত তো মেয়ে পুরা যত্ন পাইত' রূপেই নিরুপমার আশ্রয় তার গৃহে। কন্যার

Dhaka University Institutional Repository

এহেন অমর্যাদা, অপমান, নির্যাতনে বার বার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে পিতা রামসুন্দর। তাই 'মাকে ঘরে আনিবই'-প্রতিজ্ঞায় সে সবার অজান্তে বাড়ী বিক্রয় করে। 'দৈন্যপীড়িত গৃহের ক্রন্দন ধ্বনি কানে' নিয়ে রায়বাহাদুরের বাড়ীতে পণে'র দেনা শোধ করে গিয়েছে। 'এবার তোকে নিয়ে যাচ্ছি মা। আর কোনো গোল নাই ' বলে কন্যাকে নিঃসংকোচে বুকে টেনে নিয়েছে।

বাবা যে সর্বশ্রান্ত হয়ে তাকে উদ্ধার করতে এসেছে তা বুঝে রাজী হয়না নিরুপমা। সে বলে "বাবা তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও তা হলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না"৫। এখানে আমরা একটি মেয়ের দায়িত্ববোধের পরিচয় পাই, সংসার সম্পর্কে সচেতন একজন নারীকে পাই। পণ এর টাকা পরিশোধ না করা 'অপমান' বলে রামসুন্দরের মনে হলে, নিরুপমা আরোও বেশী আত্মমর্যাদা সম্পন্ন নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। "টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম! না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না। তাছাড়া আমার স্বামী তো এ টাকা চান না।"[৬] এ অংশে স্বামীর প্রতি নিরুপমার একই সাথে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। সে কাছে থাকলে তাঁর হয়তো এরকম অবস্থা হতোনা আমরা এমনটা মনে করতে পারি। কিন্তু তা হয়নি। বিয়ের অল্পদিন পরেই সে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেড হয়ে দেশ ছেড়েছে। তাই গল্পে নিরুপমার দাম্পত্য জীবনের সমস্যা সংকটের এটিও অন্যতম কারণ। আমরা দেখি যে, পুরো কাহিনী জুড়ে মানসিক যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন নিরুপমা। পিতার অবোধ কন্যাপ্রীতিতে, পণ-লোভী শ্বশুরের ভৎসনায়, শাশুড়ীর বিষাক্ত কথার বানে সর্বত্রই সে মর্মাহত, শেষ পর্যন্ত একটা গুরুতর পীড়া'র শিকার। আহার নিদ্রায় তার অনিয়ম। অনুরোধ, চাওয়া-পাওয়া থেকে বঞ্চিতা। 'নবাবের বাড়ির মেয়ে কিনা। গরিবের ঘরে অন্ন ওর মুখে রোচে না' গুরুতর রোগকে 'ওঁর সমস্ত ন্যাকামি, কেবল বাপের বাড়ি যাইবার ছল'। বলে নিন্দা করেছে শাশুড়ী। 'বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব, মা'। নিরুপমার এই শেষ চাওয়াটাও পূরণ করেনি রায়বাহাদুরের স্ত্রী। আমরা দেখি-যে আশংকা নিয়ে নিরুপমা শ্বশুড় বাড়ি গিয়েছিল তা তাকে ছাড়েনি। সত্যিই সে পণ-এর দেনার দায়ে পিতা রামসুন্দরের গৃহে সে ফিরতে পারেনি; পাওনা মেটাতে গিয়েছে চিতায়।

গল্পে নিরুপমার স্বভাবের নীরব আত্মাভিমানের ব্যক্তিত্ব লক্ষণীয়। যা বাস্তব ও বিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছে আমাদের। কিন্তু তার স্বামীর গল্প শুরুর দিকের (পিতার অবাধ্য হয়ে বিয়ের বিষয়টি) নব্য মনোভাব 'বিপত্তারণ রূপে নাটকীয়ভাবে' দেখা দিলেও গল্পশেষে তাঁর ক্ষণিক উপস্থিতি (চিঠির বিষয়টি) শূন্য, ব্যর্থ শুষ্ক বলে মনে হয়েছে আমাদের। সামাজিক একটা কুপ্রথার কারণে নিরুপমার দাম্পত্য জীবন

Dhaka University Institutional Repository

সংকটটি কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হয়নি; কালের অন্যসব ক্ষত চিহ্নের (ত্যাগ গল্পের বর্ন বৈষম্যের বিষয়টি) একটির স্বাভাবিক উপস্থাপন বলে মনে হয়েছে।

গল্পে পাত্র-পাত্রীর মুখে নব-চেতনার যেটুকু ভাষা লেখক দিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত তা টিকেনি, নিরুপমার মৃত্যুর মধ্যদিয়ে তা ম্লান হয়ে এসেছে। শেষোক্ত ব্যঙ্গেও ''বাবা , তোমার জন্য আর একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে। এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়[৭]।'' মার খেয়েছে নিরুপমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজনের ''এমন চন্দনকাষ্ঠ এ মুলুকে কেহ কখোনো দেখে নাই''– কাছেও। এখানে রায়বাহাদুরের কাছে নিরুপমার জীবন বাঁচানোর চেয়ে নিজের নাম বাঁচানোর সার্থকতা অনেক বেশী হয়ে উঠেছে। এই রায়বাহাদুরের মধ্যদিয়ে মধ্যযুগীয় সামন্তশ্রেণীর চেহারা প্রকাশ পেয়েছে। জীবন্ত মানুষ এদের প্রয়োজন কেবল শোষণের জন্য। অন্য কোন মানবিক মূল্য নেই এদের কাছে। তাই রায়বাহাদুরের কাছেও জীবিত মানুষ অপেক্ষা চিতায় চাপানো শব অনেক বেশী মূল্য বহন করছে। এর সঙ্গে লেখকের সামাজিক অভিপ্রায়টি যেরূপ স্পষ্টতা পেয়েছে, কাহিনীর লোকজন যতটা সত্য হয়ে উঠেছে সেই তুলনায় মানব অস্তিত্বের কোনো অন্তহীন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করাতে পারেনি।

২. দান-প্রতিদান

''দান-প্রতিদান''(১২৯৯) একই সাথে প্রীতি ও তিক্ততার কাহিনী। পারিবারিক ঘটনা প্রধান এ গল্পে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে একটি সংকট আছে। একান্নবর্তী পরিবারের দুই ভাইয়ের, মধ্যে অন্তরঙ্গতার আড়ালে সম্পত্তি নিয়ে গোপন ষড়যন্ত্র, ঘরে উভয়ের স্ত্রীদের মধ্যে ঈর্ষাকলহ প্রভৃতি বাঙালি জীবনের অতি চেনা-জানা কয়েকটি দিক এই গল্পে রূপ লাভ করেছে। শশীভূষণের অসীম ক্ষমা এবং রাধামুকুন্দর গভীর সদিচ্ছা এই গল্পের একান্নবর্তী পরিবার টিকে থাকার পেছনে কাজ করেছে। গল্পটিতে ' সম্পত্তি-কে কেন্দ্র করে তাদের দুই ভাইয়ের দাম্পত্য-জীবনে যে সাময়িক মন কষাকষি, এবং তাদের স্ত্রীরা-যে নিজেদের অসুখী ও পরস্পরকে হিংষা করত,সেই বিবেচনায় গল্পটির বিশেষ মূল্য আছে। এতে- সংসার জীবনের রূপটি প্রকাশ পেয়েছে তা বাঙালি পরিবারে প্রতি নিয়ত ঘটমান বিষয় বলেই মনে হয়েছে আমাদের। গল্পে রাধামুকুন্দকে বুদ্ধিমান, কর্মতৎপর ব্যক্তি হিসেবে মনে হয়। শশীভূষণের প্রতি প্রীতি এবং তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনের মধ্য দিয়ে আমরা সে প্রমাণ পাই। আপাত দৃষ্টিতে স্ত্রীর প্ররোচনায় সে প্ররোচিত হয়েছিল এমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক। বাস্তব সত্য, তা নয়। স্ত্রীর, ক্রমান্বয় অনুযোগ এবং

Dhaka University Institutional Repository

বড় বউয়ের আচরণ তার মানস স্থিতিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল সত্য কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত টিকেনি। মৃত্যু পথযাত্রী শশীভূষণের দু'পা ধরে সে বলেছে-

> "দাদা, আমি যে মহাপাতকের কাজ করিয়াছি তাহা তোমাকে বলি, আর তো সময় নাই। .. মনের যথার্থ যে ভাব সে অন্তর্যামী জানেন, আর পৃথিবীতে যদি কেহ বুঝিতে পারে তো হয়তো তুমি পারিবে। বালক কাল হইতে তোমাতে- আমাতে অন্তরে প্রভেদ ছিলনা, কেবল বাহিরে প্রভেদ। কেবল এক প্রভেদছিল-তুমি ধনী, আমি দরিদ্র। যখন দেখিলাম, এই সামান্য সূত্রে তোমাতে-আমাতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্রমশই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, তখন আমিই সেই প্রভেদ লোপ করিয়াছিলাম। আমিই সদর খাজনা লুট করাইয়া তোমার সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছিলাম।"[৮]

শশীভূষণও তাকে কাছে ডেকে তাঁর হাত ধরে অত্যন্ত স্নেহভরে ক্ষমা করে দিয়েছে। বলেছে-"একথা আমি প্রথম হইতেই জানিতাম, তুমি যাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে, তাহারাই আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। আমি তখন হইতে তোমাকে মাপ করিয়াছি।"[৯] তারা দু'জন সহোদর নিকট সম্পর্কের কোনো ভাই নয়, প্রায়-গ্রাম সম্পর্কের ভাই। 'কিন্তু প্রীতিবন্ধনে সহোদর ভাইয়ের চেয়ে কিছু কম নয়।' গল্পটিতে একান্নবর্তী বাঙালি পরিবারের খুঁটিনাটি দুঃখবোধ, সম্পত্তি নিলাম-কে কেন্দ্র করে দুইভাই ও তাদের স্ত্রীদের প্রভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত কোন রূপ অসংগতি আছে বলে আমাদের মনে হয় না। আমাদের চারপাশের প্রতিদিনের চেনা ঘটনা বলেই মনে হয়।

৩. জীবিত ও মৃত

জীবিত ও মৃত (১২৯৯) গল্পটি আবহ প্রধান গল্পের পর্যায়ভূক্ত। রবীন্দ্রনাথের আবহ-প্রধান গল্পগুলিতে তাঁর অন্তলীন কবি-প্রকৃতিই একাধারে স্রষ্টা, এবং সৃষ্টির বিষয়ও। সফল সার্থক শিল্প সৃষ্টিতেই শিল্পীর মনের পূর্ণতা। গল্পটিতে বিশেষ কোনো প্রেম ও দাম্পত্যের চিত্র নেই। বিধবা 'কাদম্বিনী'-কে নিয়েই গল্পের শুরু এবং শেষ। মাঝখানে আত্ম-জ্ঞানহীন মানুষের আত্ম-সন্ধানের রহস্য করুণ এক ছবি। তাতে ব্যতিক্রম কেবল যোগমায়ার সংসার। যেখানে দাম্পত্য সুখের একটা চিত্র আছে। গল্পে উল্লেখ না থাকলেও আমাদের মনে হয়েছে যে, কাদম্বিনীর স্বামী থাকলে, তাঁর সংসারও' সই যোগমায়ার সংসারের মত হতে পারতো । কিন্তু

> "রানী হাটের জমিদার শারদাশংকরবাবুদের বাড়ির বিধবা বধূটির পিতৃকুলে কেহ ছিলনা' সকলেই একে একে মারা গিয়াছে। পতিকুলেও ঠিক আপনার বলিতে কেহ নাই, পতিও নাই পুত্রও নাই। একটি ভাগুরপো, শারদাশংকরের ছোট ছেলেটি, সেই তাহার চক্ষের

Dhaka University Institutional Repository

মণি।...তাহারা উপরে কোনো সামাজিক দাবি নাই, কেবল স্নেহের দাবি- কিন্তু কেবল মাত্র স্নেহ সমাজের সমক্ষে আপনার দাবি কোনো দলিল অনুসারে সপ্রমাণ করিতে পারে না এবং চাহেও না, কেবল অনিশ্চিত প্রাণের ধনটিকে দ্বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত ভালোবাসে। বিধবাবার সমস্ত রুদ্ধ প্রীতি এই ছেলেটির প্রতি সিঞ্চন করিয়া একদিন শ্রাবণের রাত্রে কাদম্বিনীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল"।[১০]

কিন্তু চিতায় দাহ করার আগেই সেই মৃত দেহে প্রাণের সঞ্চার হলো। "যেন খাটটা ঈষৎ নড়িল, যেন মৃতদেহ পাশ ফিরিয়া শুইল।...বিধু এবং বনমালী কুটিরের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। নিতাই এবং গুরুচরণ অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিল, ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মৃতদেহ নাই, শূন্য খাট পড়িয়া আছে।.....সন্ধান করিতে করিতে বাহিরে গিয়া দেখে কুটিরের দ্বারের কাছে খানিকটা কাদা জমিয়াছিল,তাহাতে স্ত্রীলোকের সদ্য এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্ন।"[১১] এ থেকেই রহস্যের শুরু এবং তা উন্মোচন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা। তবে শ্মশানে গিয়ে আবার যে কাদম্বিনী বেঁচে উঠল সেটা ভৌতিক মায়া-মরিচিকার ব্যাপর নয়, প্রত্যক্ষ সত্য। বরং সেকালের য়ুরোপে এরকম একাদিক ঘটনা প্রায় একই সময়ে ঘটেছিল।"[১২] কিন্তু হলেই বা কি কুসংস্কার আছে যে, 'মানুষ মরে ভূত হয়, সেই কুসংস্কারের প্রভাবে জগৎ-সংসারের কোথাও কাদম্বিনীকে, প্রত্যক্ষ দেখেও মানুষ রূপে কেউ ভাবতে পারেনি।"[১৩] অন্ধ কুসংস্কারের বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে নিজের প্রত্যক্ষ জীবনকে অসত্য বলে মনে হয়েছে কাদম্বিনীরও "আমি তো বাঁচিয়া নাই।..... জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্বাসিত হইয়া আসিয়াছি- আমি যে আমার প্রেতাত্মা।[১৪] নিশিন্দাপুরের শ্রীপতিচরণবাবুই তাকে অতি স্নেহে স্থান দিতে চেয়েছিলেন -" নিশ্চয়ই শ্বশুর বাড়ির লোকেরা এই পুত্রহীনা বিধবার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিত, তাই নিতান্ত সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়া কাদম্বিনী আমার আশ্রয় লইয়াছে। যখন ইহার বাপ মা কেহই নাই তখন আমি ইহাকে কী করিয়া ত্যাগ করি।"[১৫] কিন্তু সই যোগমায়ার সঙ্গে সে মিশতে পারেনি, আত্ম সম্বন্ধে সন্দেহের কারণে- "মাঝে যেন মৃত্যুর ব্যবধান। যোগামায়াকে দেখে তার মনে হয়েছে- " স্বামী এবং ঘরকন্না লইয়া ও' যেন বহুদূরে আর এক জগতে আছে। স্নেহ- মমতা এবং সমস্ত কর্তব্য লইয়া ও'যেন পৃথিবীর লোক, আর আমি যেন শূণ্য ছায়া। ও'যেন অস্তিত্বের দেশে, আমি যেন অনন্তের মধ্যে"।[১৬] নিজেকে সে পৃথিবীর হাসি কান্নায় মেতে থাকা মানুষ ভাবতে পারে না, কেবলই ছায়া মনে হয়। শেষে রাণী হাটে এসে ভাশুরের ছোট খোকাকে বুকে নিয় তাঁর এ- ভুল ভেঙ্গেছে ।-

"সে মরে নাই, সেই পুরাতন ঘরদ্বার, সেই সমস্ত, সেই খোকা, সেই স্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবন্ত ভাবেই আছে, মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ কোনো ব্যবধান জন্মায় নাই।... খোকার কাকি

Dhaka University Institutional Repository

মাতো একতিলও মরে নাই।"[১৭] কিন্তু শারাদাশংকরবাবু জোর হাত করে কাদম্বিনীকে বলল-" ছাটোবউমা এই কি তোমার উচিত হয়। সতীশ আমার বংশের একমাত্র ছেলে, উহার প্রতি তুমি কেন দৃষ্টি দিতেছ। ...যখন সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ তখন এ মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া যাও- আমরা তোমার যথোচিত সৎকার করিব।"[১৮]

কাদম্বিনী তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করল। সে তখন কাসার বাটি দিয়ে নিজের কপালে আঘাত রক্ত ঝরিয়ে, প্রমাণ করবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল । কাজেই তাকে মরিয়াই প্রমাণ করতে হলো সে মরে নাই। 'ওগো আমি মরিনাই গো, মরি নাই গো, মরি নাই' বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া, সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। শারদাশংকর উপরের ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন ঝপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল।"[১৯] গল্পের -"শেষ পর্যায়ে কাদম্বিনীর মৃত্যু কোনো বিকৃত-মস্তিষ্কের অপমৃত্যু নয়, সুস্থ জীবনপ্রীতির আত্মহত্যায় অবসান।"[২০] গল্পটিতে সামাজিক কুসংস্কারের মধ্যে স্বামী-সন্তানহীন হয়ে সংসারে টিকে থাকার লড়াই এবং শেষ পর্যন্ত বিধবার করুন পরিণতি দুটি সুখী দম্পতির (শ্রীপতি ও যোগমায়া এবং শারদাশংকর বাবুর পরিবার) বৈপরীত্যে লালিত্যময় ভাষায় উপস্থাপিত। এ গল্পে আমাদের দৃষ্টিতে বেশী অসংগতিপূর্ণ মনে হয়েছে সমাজ-পরিবারে কাদম্বিনীর নিঃসঙ্গতা।

৪. শাস্তি

পারিবারিক কলহকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা, সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর গল্প 'শাস্তি' (১৩০০)।

গল্পে একটি খুনের ঘটনা আছে। খুনটি করেছে দুখিরাম- সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে ভাত না পেয়ে তার স্ত্রী রাধাকে। সেই খুনের দোষ চাপিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়েছে চন্দরাকে। দরিদ্র-পীড়িত নিম্নবর্ণভুক্ত বাঙালির জীবনচিত্র অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এখানে। গল্পে পারিবারিক কলহটি দুই জা-রাধা ও চন্দরাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এবং দুই দম্পতি- চন্দরা-ছিদাম ও রাধা- দুখিরামকে কেন্দ্র করে হয়েছে বিস্তৃত। আমরা দেখি যে, ছিদাম ও দুখিরাম এই দুই ভাইয়ের মধ্যে যত ভাব, এদের স্ত্রীদের মধ্যে ততটাই ভাবের অভাব।

"তাহারা দুই ভাই যেন দীর্ঘ সংসারপথ একটা এক্কাগাড়িতে করিয়া চলিয়াছে, দুই দিকের দুই স্প্রিংবিহীন চাকার অবিশ্রাম ছড়ুছড়ু খড়ুখড়ু শব্দটাকে জীবনরথযাত্রার একটা বিধিবিহিত নিয়মের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে।"[২১]

দুই দম্পতির মধ্যে- চন্দরা ও ছিদামের পারস্পরিক সম্পর্কটি অধিকতর প্রকট হয়ে উঠেছে গল্পে। ছিদাম সুপুরুষ- চুল পরিপাটি করে ,সাজসজ্জায় যত্ন আছে তার। সেই সঙ্গে আছে গ্রাম্যবধূদের প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

যথেষ্ট আকর্ষণও । "তবু ছিদাম তাহার যুবতী স্ত্রীকে একটু বিশেষ ভালোবাসিত। উভয়ে ঝগড়াও হইত, ভাবও হইত, কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিত না।"[২২]। আর একটি কারণে তাদের পারস্পরিক বন্ধন কিছুটা সুদৃঢ় ছিল- ছিদাম মনে করতো, চন্দরা চঞ্চল প্রকৃতির স্ত্রীলোক তাকে যথেষ্ট বিশ্বাস নেই; আর চন্দরাও মনে হতো- 'স্বামীটির চতুর্দিকেই দৃষ্টি,তাহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোন্‌দিন হাত ছাড়া হইতে আটক নাই।' তাই সে স্বামীর মনে ঈর্ষা জাগাবার জন্য– "যখন তখন ঘাটে যাইতে আরম্ভ করিল এবং পাড়া পর্যটন করিয়া আসিয়া কাশী মজুমদারের মেজো ছেলেটির প্রচুর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।"[২৩]

চন্দরার এই স্বভাব চটুলতার কারণে ছিদাম উদ্‌বিগ্ন হতো এবং স্ত্রীকে হাতের মুঠোয় পুরে রাখতে চাইতো। একদিন- 'এবার যদি কখনো শুনি তুই একলা ঘাটে গিয়েছিস, তোর হাড় গুড়াইয়া দিব' -বলে সে চন্দরার চুলের মুঠি ধরে টেনে ঘরের মধ্যে পুরে বাইরে দিয়ে দ্বার বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু সন্ধায় কর্মস্থল থেকে ফিরে এসে দেখেছে-'ঘরে কেহ নাই'। চন্দরা তিনটে গ্রাম পার হয়ে একেবারে তার মামার বাড়ি চলে গিয়েছে। পরস্পরের এরূপ সন্দেহ ঈর্ষা এবং ভালোবাসায় তাদের সহজ দাম্পত্যের মধ্যে জন্ম নিয়েছে অবিশ্বাস। আমাদের দৃষ্টিতে চন্দরা এখানে সমকালীন সময়ের বলিষ্ট নারী চরিত্র । তাঁর প্রতি ছিদামের চরম দায়িত্বহীনতা, উপেক্ষা -মেনে নিতে চায় না সে। সে চায় স্বামীর অনিয়ম-অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে। তাঁর প্রাণ ধর্মীতা তাকে স্বামীর সঙ্গে সমাধিকারের প্রশ্নে আত্মসচেতন করে তোলেছে। কিন্তু পুরুষ প্রধান সমাজের প্রতিনিধি ছিদাম তাঁর স্ত্রী চন্দরাকে সেই অধিকার দিতে চায়না ,সে মানসিক অস্থিরতা নিয়ে ভাবে -'এ যদি মরিয়া যায় তবে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি শান্তিলাভ করিতে পারি। মানুষের উপরে মানুষের যতটা ঈর্ষা হয় যমের উপরে এতটা নহে।'কিন্তু চন্দরার জীবনমুখিতা যখনই পুরুষ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে তখনই সে জ্বলে উঠেছে আপন ব্যক্তিত্বের মহিমায়। স্বামী ছিদামরুই তাকে যতই নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছে ,চন্দরা যেন ততই বন্ধনহীন পাখির মতো উড়বার আকাশ খুঁজেছে। উদ্ধৃতি-"চন্দরাকে যখন তাহার স্বামী খুন স্বীকার করিয়া লইতে কহিল, সে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল; তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নিরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সংকুচিত হইয়া স্বামীরাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা একান্ত বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল।"[২৪] তাই যতবার জেরা হয়েছে ততবারই সে হত্যার দায় স্বীকার করে নিয়েছে এবং এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে বড়ো জা'র কোনো প্ররোচনাকে সে স্বীকার করেনি। কারণ যে কোনো নারীর পক্ষেই কাপুরুষের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা অনুচিত বলে বিবেচিত। "ঠাকুর,বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাসিঁ গেলে আর

Dhaka University Institutional Repository

তো ভাই পাইব না"[২৫] মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে অভিজ্ঞ পরামর্শক রামলোচন চন্দরাকে বাঁচানোর পরামর্শের জবাবে ছিদামের -এহেন উক্তি স্ত্রীর প্রতি চরম অবজ্ঞা, অবমাননা এবং অত্যন্ত নির্মমতাকেই ইঙ্গিত করে। এবং আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পারি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান কতো করুণাঘন, কতো গৌণ। তাই স্বামীর হৃদয়হীন কাপুরুষোচিত আচরণে জীবনের প্রতি সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে চন্দরা। খুনের শাস্তি ফাঁসি জেনেও অসহ্য ভারযুক্ত এই জীবনকে ফাঁসিকাঠেই সমর্পিত করতে চেয়েছে সে। 'নিদারুন অভিমানোহত নারীর আর প্রবৃত্তি হয়নি কাপুরুষ নির্লজ্জ স্বামীর সঙ্গে সংসার করার। একখানি নতুন-তৈরি নৌকার মতো মেয়ে চন্দরা জীবন সম্পর্কে সমস্ত কৌতূহল হারিয়ে, দাম্পত্য সংসারের সব আয়োজন -স্বপ্ন ভুলে সবকিছু ছেড়ে সে এক নতুন সত্তার অধিকারী হয়ে উঠে। তাঁর সমস্ত জীবনাগ্রহ সংকুচিত হয়ে কেবল একটি বন্ধনে এসে থেমে যায়। খুন না করেও খুনের শাস্তি 'ফাঁসিকে নেবার বেলা চন্দরা ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেছে 'সবল' ব্যক্তিত্বময়, প্রতিবাদী। তাই স্বামীর হীনতাকে ধিক্কার জানিয়ে মনে মনে সে বলেছে-"আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম- আমার ইহজন্মের শেষবন্ধন তাহার সহিত।"[২৬]

আর সে কারণেই হয়তো স্বামী কোর্টে সাক্ষ্য দিতে এলেও চন্দরা একবারও তাকায়নি তার দিকে। ছিদাম তাকে ভালোবাসে কিনা জানতে চাওয়া হলে সে বলে 'উঃ ভারি ভালোবাসে।' তার এই 'উঃ' এর মধ্য দিয়ে সে স্বামীর ভালোবাসর প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্রূপ প্রকাশ করেছে । দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে প্রেম যেখানে অবিশ্বাসের সঙ্গে মিলে সম্পর্ককে মধুর করে রেখে ছিল সেই মধুরতা এক নিমেষে মুছে গিয়ে অবিশ্বাসের নাগপাশে তা শেষ রূপান্তর হতে দেখি তীব্র ঘৃণায়।

চন্দরার ফাঁসির পূর্বে স্বামী তাকে শেষ দেখা দেখতে চাইলে সে-'মরণ' বলে স্বামীর শেষ ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করে, মিথ্যা কলঙ্কের প্রতিবাদ করে স্বামীকে চূড়ান্ত সাজা দিয়েছে। তারপর সে -"একটি নিরীহ ক্ষুদ্র চঞ্চল কৌতুকপ্রিয় গ্রাম্যবধু, চির-পরিচিত গ্রামের পথ দিয়া ,রথতলা দিয়া , হাটে মধ্য দিয়া ঘাটের প্রান্ত দিয়া, মজুমদারের বাড়ির সম্মুখ দিয়া, পোস্টাপিস এবং ইস্কুলঘরের পার্শ্ব দিয়া,সমস্ত পরিচিত লোকের চক্ষের উপর দিয়া, কলঙ্কের ছাপ লইয়া চিরকালের মতো গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।"[২৭]

চন্দরার এভাবে প্রস্থান আমার কাছে একটা পুরানো সময় পরিবর্তন করে নতুন সময় বয়ে আনবার অনুপ্রেরণা বলে মনে হয়েছে। "আধুনিক পরিভাষায় তাকে অত্যাচার-অবিচারের প্রতিবাদে মৃত্যু-ধর্মঘট বললেও বুঝি ভুল হয় না।"[২৮] কেননা, মানসিক অবস্থার যে পর্যায়ে এসে দুখিরাম তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে সেই অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী পরোক্ষভাবে সেই জমিদার যার কাছারি থেকে পেয়াদা এসে জবরদস্তি ক'রে তাদের দুই ভাইকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল । সারাদিন তারা সেখানে খেটেছে, অনেক

Dhaka University Institutional Repository

বকা-ঝকা শুনেছে, এবং উচিত মত পাওনা- মজুরি না পেয়ে ক্ষোভ-যন্ত্রণা নিয়ে ঘরে ফিরেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজে উপরিওয়ালাদের শোষণের ফলে নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে কী সকরুণ অসহায়তা জন্ম নিয়েছিল তার সহজ পরিচয় দিতেই বুঝি রবীন্দ্রনাথ রাধাকে হত্যার এ পটভূমি রচনা করেছিলেন। আর চন্দরাকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়ে তিনি দুখিরাম-ছিদামের সংসাকে একেবারে শূণ্য করে দিলেন তা সমকালের সমাজব্যবস্থায় তাদের চিরন্তন শূন্যতাকে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেবার জন্যই মনে হয় ।

৫. খাতা

রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে বেড়ে উঠা এক বালিকা বধুর 'একটুখানি স্নেহমধুর স্বাধীনতার আস্বাদ' লাভের অসফল চেষ্টা খাতা (১৩০১) গল্প। এতে উমার শৈশবের কচিমনে একটি ছোট্ট খাতার প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং শ্বশুরালয়ে গিয়ে সংবেদনশীল হৃদয় নিয়ে সেই খাতায় জীবনের খুটিনাটি -সমস্ত দুঃখবোধ লিখে রাখা তার আনন্দ ও অন্যদের নিরানন্দের বিষয়টি সাধারণ ভাব ও ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা দেখি যে, খাতার প্রতি উমার সংবেদনশীল শিল্পী হৃদয়ের আকর্ষণ তাকে প্রথমে পিতৃগৃহে দাদা গোবিন্দলালের কাছে শাসিত এবং পরবর্তীতে স্বামীগৃহে ননদিনী ও স্বামী প্যারিমোহনের কাছে পরিহাসের বস্তু হয়ে উপেক্ষিত, নিয়ন্ত্রিত হতে হয়েছে। উমার দাদা এবং স্বামী খবরের কাগজের সহযোগী লেখক হলেও তারা দু'জনই ছিলেন পুরুষশাসিত রক্ষণশীল সমাজের প্রতীক। বালিকা বধূ উমা পিতৃগৃহে যেতে চাইলে প্রথমে তার দাদাই তাকে বাধা দিয়েছে-

> "এখন উমার পতিভক্তি শিক্ষার সময়, এখন তাহাকে মাঝে মাঝে পতিগৃহ হইতে পুরাতন পিতৃস্নেহের মধ্যে আনয়ন করিলে তাহার মনকে অনর্থক বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয় ।"[২৯]

উমা তার মনের কথা গোপন খাতার মধ্যে অকপটে লিখতে গিয়ে ননদিনীদের কাছে ধরা পড়ে গেলে তার স্বামী চিন্তিত হয়েছে এই ভেবে যে- "পড়াশুনা আরম্ভ হইলেই নভেল নাটকের আমদানী হইবে এবং গৃহধর্ম রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে।"[৩০] এহেন পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার আবর্তে উমার সংবেদনশীল কোমল হৃদয়ের অনুভূতিগুলোর প্রকাশ চেষ্টা খুব স্বাভাবিক । কিন্তু অস্বাভাবিক মনে হয় প্যারিমোহনদের মতো হীন মানসিকতা সম্পন্ন সমাজপ্রভু কর্তৃক নারীকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার অভিপ্রায়কে,তাদের নিয়ন্ত্রণ করার দুর্ভিসন্ধিকে। এক্ষেত্রে আমাদের সামনে উমা- প্যারিমোহনের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, নির্ভরতার বন্ধন নয় বরং শাসন এবং কৌশলের চিত্রটিই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

> "বিশেষ চিন্তা দ্বারা এ বিষয়ে সে একটি অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছিল। সে বলিত, স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্যশক্তির উদ্ভব হয়;কিন্তু লেখাপড়া শিক্ষা দ্বারা যদি স্ত্রীশক্তি পরাভূত হইয়া একান্ত পুংশক্তির প্রদুর্ভাব হয়,তবে পুংশক্তির সহিত পুংশক্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয়শক্তির উৎপত্তি হয় যদ্দ্বারা দাম্পত্যশক্তি বিনাশশক্তির মধ্যে বিলীনসত্তা লাভ করে, সুতরাং রমণী বিধাব হয়। এ পর্যন্ত এ তত্ত্বের কেহ প্রতিবাদ করিতে পারে নাই।"[৩১]

গল্পে উমার স্বামীর সম্পর্কে লেখকের এই বর্ণনাতেই আমরা প্যারিমোহনের আসল পরিচয় পেয়ে যাই যে কেবল নিজ স্ত্রীকে নয়, ঐ তত্ত্বকথা দিয়ে সমস্ত নারীসমাজকে অত্যন্ত অমর্যাদার ছায়ায় এনে দাঁড় করেছে। নিরীহ উমা স্বামীর আদেশের কোনো প্রতিবাদ না করে- "খাতাটি বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া একান্ত অনুনয়দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। যখন দেখিল, প্যারিমোহন খাতা কাড়িয়া লইবার জন্য উঠিয়াছে তখন সেটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।"[৩২] তখন খাতার সঙ্গে উমার সমস্ত ইচ্ছার অপমৃত্যু বলেই মনে হয় আমাদের এবং উমাকে মনে হয় সমকালের সমাজ ব্যবস্থায় অধিকারহীন -স্বাধীনতাহীন দাম্পত্য সুখ বঞ্চিতা নারীদের প্রতিনিধি।

৬. মেঘ ও রৌদ্র

মেঘ ও রৌদ্র (১৩০১) গল্প উনিশ শতকের বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। তা সত্ত্বেও নর-নারীর সম্পর্ক রূপায়ণে এক ভিন্নধারার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গল্পটিতে। দশ বছর বয়সের বালিকা গিরিবালা এবং সদ্য বিকশিত এম.এ. বি. এল. শশিভূষণকে কেন্দ্র করে তা বিকশিত। মেঘ ও রৌদ্র গল্পটি বেশ বড় আকারের ছোট গল্প হলেও কাহিনী পল্লবিত নানা শাখায় প্রসারিত কিংবা অভিপ্রায় কেন্দ্র চ্যুত নয়। গল্পে মেঘ ও রৌদ্রের পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক পটভূমি নায়িকা গিরিবালার চঞ্চল চিত্তের প্রতীক ও সুখ-দুঃখ সংলগ্ন। এবং তা সমকালীন সমাজ-রাজনীতির প্রেক্ষিতে তাদের দু'জনের জীবনের নানা ঘটনা প্রবাহের আবহে আবহমণ্ডিত।

> "আকাশে মেঘরৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য, ধরাপ্রান্তে এই দুটি প্রাণীর খেলাও তেমনি সামান্য, তেমনি ক্ষণস্থায়ী। আবার আকাশে মেঘ রৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য নহে এবং খেলা নহে, কিন্তু খেলার মতো দেখিতে মাত্র, তেমনি এই দুইটি অখ্যাতনামা মনুষ্যের একটি কর্মহীন বর্ষাদিনের ক্ষুদ্র ইতিহাস সংসারের শত শত ঘটনার মধ্যে তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু ইহা তুচ্ছ নহে।"[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

মেঘ ও রৌদ্র গল্পে বয়সের অসমতা গিরিবালার প্রেম সম্পর্কে গ্রামবাসীদের উদসীনতা এবং সাধারণ পাঠকের মনে কোনো প্রশ্ন না উঠলেও তা এড়িয়ে যাবার বিষয় নয়। কেননা আমরা গভীর অন্তদৃষ্টি নিয়ে লক্ষ করেছি যে -একটি মানসিক বন্ধন সুদৃঢ় হবার ক্রমশ চেষ্টা চলেছে -এ গল্পের কাহিনীতে। এবং এর প্রায় ষোলআনাই গিরিবালার পক্ষ থেকে, শশিভূষণের পক্ষ থেকে নয়। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেবল গিরিবালার শ্বশুর বাড়ি যাবার চিত্রটি। তাই গিরিবালার সঙ্গে শশিভূষণের যে সম্পর্ক তা সরাসরি প্রেম নয়, হৃদয় ব্যাকুলতার এক গাঢ় বন্ধন।

> "বালিকা যখন ক্ষণে ক্ষণে অবনত হইয়া কোনো একটি অনির্দেশ্য কাল্পনিক পদার্থের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল তখন যুবক মনের হাস্য গোপন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে একটি একটি জাম নির্বাচন করিয়া সযত্নে আহার করিতেছিল। অবশেষে যখন দুটো- একটা আঁটি দৈবক্রমে বালিকার পায়ের কাছে, এমন-কি , পায়ের উপরে আসিয়া পড়িল, তখন গিরিবালা বুঝিতে পারিল যুবক বালিকার অভিমানের প্রতিশোধ লইতেছে। কিন্তু এই কি উচিত! যখন সে আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর সমস্ত গর্ব বিসর্জন দিয়া আত্মসমর্পণ করিবার অবসর খুঁজিতেছে তখন কি তাহার সেই অত্যন্ত দুরূহ পথে বাধা দেওয়া নিষ্ঠুরতা নহে। ধরা দিতে আসিয়াছে ,এই কথাটা ধরা পড়িয়া বালিকা যখন ক্রমশ আরক্তিম হইয়া পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল তখন যুবক বাহিরে আসিয়া তাহার হাত ধরিল।"[৩৪]

শুধু তাই নয়, গিরিবালার অন্তরে শশিভূষণের জন্য যে আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল তার প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শশিভূষণের জেল থেকে ছাড়া পাবার পরের ঘটনায় এবং তাঁর সমস্ত স্মৃতিকে সযত্নে লালন করার মধ্য দিয়েও। শশিভূষণ কৃতবিদ্য। কিন্তু দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা কারণে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে সে পৃথক । সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন শশিভূষণের সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র হয়ে উঠেছিল গিরিবালা। গিরিবালার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক তাকে সংসারের সঙ্গে জুড়ে রেখেছিল। কিন্তু সমাজের অন্যায়ের প্রতিকার করতে গিয়ে গিরিবালার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। বিয়ে হয়ে যায় গিরিবালার এবং সে চিরকালের জন্য শ্বশুরবাড়ি চলে যায়।

> "নৌকা ঘাট ছাড়িয়া যখন তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল তখন চকিতের মতো একবার দেখিতে পাইলেন, মাথার ঘোমটা টানিয়া নববধূ নতশিরে বসিয়া আছে। অনেক দিন হইতে গিরিবালার আশা ছিল যে, গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্বে কোনোমতে একবার শশিভূষণের সহিত সাক্ষাৎ হইবে ,কিন্তু আজ সে জানিতেও পারিল নাযে তাহার গুরু অনতিদূরে তীরে

Dhaka University Institutional Repository

দাঁড়াইয়া আছেন। একবার সে মুখ তুলিয়াও দেখিল না, কেবল নিঃশব্দ রোদনে তাহার দুই কপোল বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।"[৩৫]

শশিভূষণের এহেন অবস্থা দেখে আমাদের মনে পড়ে যায় 'একরাত্রি' গল্পের নায়কের কথা।কিন্তু 'একরাত্রি'-তে নায়কের যে আকুলতা আছে 'এ গল্পের অন্তরে তা নেই। আবার 'মানভঞ্জণ' গল্পের গোপীনাথ শীলের স্ত্রী গিরিবালার সঙ্গে 'এ গল্পের গিরিবালার মধ্যেও বহু মিলের অভাব আছে। এখানে আমরা, গিরিবালার বাল্যের সরল প্রীতি, গাঢ় বন্ধন পরবর্তীতে প্রেমের মহিমায় তরুণী হৃদয়ে বিকশিত হতে দেখি। তরুণী গিরিবালা বিধবা ধনীগৃহের কর্তী হওয়া সত্বেও শশিভূষণ সম্পর্কে তার হৃদয়ানুভূতি নষ্ট হতে দেয়নি। তাই আশ্রয়হীন সম্বলহীন শশিভূষণকে ডেকে এনে আশ্রয় দিয়েছে সে ,তাঁর বাড়িতে। তাঁর অন্তরে বেজেছে কীর্তনের সুর-'এসো এসো ফিরে এসো- নাথ হে, ফিরে এসো।

৭.প্রায়শ্চিত্ত

449598

'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩০১) নারী নিগ্রহ এবং পুরুষের স্বভাব বিকারের গল্প। শুধু পুরুষের স্বভাব বিকার নয়, নারী নিগ্রহে নারীরও যে ভূমিকা থাকে সেই দিকটিও উঠে এসেছে গল্পে । বাঙালি নারীর নির্বিচার পতিভক্তির মধ্যে যে আত্মঅবমাননা রয়েছে সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ আছে লেখকের। নারীর প্রেম -ভালোবাসা বিশ্বাস ইত্যাদি চরমভাবে উপেক্ষিত হয়েছে গল্পটিতে। এবং তা নারীর প্রতিবাদহীন প্রশ্রয়ে পেয়েছে স্থায়ী আসন। 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে বিন্ধ্যবাসিনীর স্বামী অনাথবন্ধু অলস, কর্মবিমুখ, শ্বশুরবাড়িতে আশ্রিত। তা সত্ত্বেও বিন্ধ্যবাসিনী হয়েছে স্বামী গর্বে গর্বিত- উচ্ছ্বসিত। কিন্তু তার স্বামীভক্তি এবং স্বামী গর্বের বিপরীতে অনাথবন্ধুর স্ত্রীর প্রতি চরম হৃদয়হীনতাই প্রকাশ পেয়েছে।

> "স্ত্রী নামটি অনাথবন্ধু পছন্দ করেন নাই এবং স্ত্রীটিকেও রূপে গুণে তিনি আপন যোগ্য জ্ঞান করিতেন না, কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনীর মনে স্বামীসৌভাগ্যগর্বের সীমা ছিল না। সকল স্ত্রীর সকল স্বামীর অপেক্ষা তাঁহার স্বামী যে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এ সমন্ধে তাঁহার কোনো সন্দেহ ছিল না, বরং তাঁহার স্বামীরও কোনো সন্দেহ ছিল না, এবং সাধারণের ধারণাও এই বিশ্বাসের অনুকূল ছিল।"[৩৬]

ধনী পিতার আদরের মেয়ে বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীগৃহে শাশুড়ীর স্নেহ বঞ্চিত নয়। তাঁর আসল নিগ্রহ স্বামী অনাথবন্ধুর স্বভাব থেকে। "স্ত্রীর নিকটে গিয়া তাহার পিতৃনিন্দা করিয়া তাহাকে কাঁদাইয়া দিয়া শ্বশুরের উপর প্রতিশোধ তুলিলেন"[৩৭]

শ্বশুরবাড়িতে আশ্রিত অনাথবন্ধু এক ধরনের 'ফাঁপা' অহংকার নিয়ে তৃপ্ত ছিল। স্ত্রীর ভক্তি ও সেবায় শ্বশুর বাড়িতে তাঁর রাজকীয় সম্মান-আরাম-সম্ভোগ, অন্যের উপার্জনে পাড়ায় মাতাব্বরী করে বেড়ানো

Dhaka University Institutional Repository

তার এক ধরনের অধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেন। যখনই এর ব্যতিক্রম ঘটেছে তখনই সে অত্যন্ত হীন কাজে নিয়োজিত হয়েছে।

'আজকাল বিলেতে না গেলে কোনো ভদ্র চাকরি পাওয়া যায়না' বলে সে বিলেতে যাবার খরচ হিসেবে শ্বশুরের অর্থ লুটেছে। সেখানে গিয়ে স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে সে আনন্দ -ফূর্তি করেছে। দেশে ফিরে এসে মা কিংবা স্ত্রীর কাছে না গিয়ে নিসংকোচে হোটেলে গিয়ে থেকেছে।

এহেন স্বামীর প্রতিও স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনীর আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিল না। সে- স্বামী দেবতার জীবনের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকতে পারার মধ্যেই জীবনের সবটুকু গৌরবের ও আনন্দের মনে করেছে। স্বামীর কাছ থেকে বার বার আঘাত পেয়েও বিলেত ফেরত হোটেলবাসী স্বামীকে দেখে তার মনে হয়েছে– 'আজকাল ঢের লোক তো সাহেব হয়, কিন্তু এমন কাহাকেও মানায় না –একেবারে ঠিক যেন বিলাতি সাহেব ! বাঙালি বলিয়া চিনিবার যো নাই।"[৩৮] আবার এই সাহেব স্বামীর প্রায়শ্চিত্তের ভণ্ডামি দেখে তাকে আমরা যুগপৎ আনন্দিত ও গর্বিত হয়ে উঠতে দেখি। সে মনে মনে বলেছে –

> "আমার স্বামী একেবারে অবিকৃতভাবে ফিরিয়াছেন, বরঞ্চ তাঁহার হিন্দুধর্মে ভক্তি পূর্বাপেক্ষা আরও অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে।"[৩৯] স্বামীর প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন দেখে তার মনে হয়েছে-" প্রায়শ্চিত্ত যে অপরাধ স্বীকার তাহা নহে, এ যেন অনুগ্রহ প্রকাশ।..... সেই গৌরবচ্ছটা সমস্ত দেশ হইতে সহস্র রশ্মিতে বিচ্ছুরিত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনীর প্রেমপ্রমুদিত মুখের উপরে অপরূপ মহিমাজ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে।"[৪০]

এইভাবে অশ্রদ্ধেয়ের প্রতি ভক্তি–শ্রদ্ধা,মানস আত্মসমর্পণ নারীর দুর্ভাগ্যের বোঝা আরো বাড়িয়ে তোলে বিন্ধ্যবাসিনীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে নেমে সেই সত্যটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। স্ত্রীর প্রতি স্বামী কর্তৃক প্রতারণার শেষ যেটুকু বাকি ছিল তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের সমারোহের মধ্যে - ইংরেজ মহিলার 'দাম্পত্য মিলন চুম্বন'-এর মধ্যে দিয়ে। বিন্ধ্যবাসিনীর সরল বিশ্বাসের মূলে এই আঘাত অনাথবন্ধুর ব্যক্তিত্বহীনতা চৌর্যবৃত্তি, কাপুরুষতাকেই প্রমাণ করে। যার ফলে, গল্পটিতে স্ত্রীর অপরিমেয় ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও স্বামী তাকে সেই ভালোবসার প্রতিদান দেয়নি অনেক সহজ সম্ভবনা থাকার পরও তাঁদের জীবন সত্যিকারের দাম্পত্য-জীবন হয়ে ওঠেনি। 'প্রায়শ্চিত্ত'-গল্পটি আসলে একজন অমানবিক নির্লজ্জ পুরুষের বিপরীতে মধ্যযুগীয় সংস্কার সংলগ্ন অসচেতন, ব্যক্তিত্বহীন হিন্দুনারী অপ্রত্য ভালোবাসার কাহিনী, যা সমকালের দাম্পত্য-সংকট প্রকাশে লেখকের আন্তরিক অভিপ্রায়।

Dhaka University Institutional Repository

৮. বিচারক

'বিচারক'(১৩০১) গল্পটি ছোট আকারের বড় কাহিনীর ছোটগল্প । কাহিনীটি ক্ষীরোদা নামের একজন পতিতার কাহিনী। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে ,সমাজে নারী লাঞ্ছনার বিশেষ এই দিকটি নিয়ে এটি দ্বিতীয় বিশিষ্ট লেখা। ১৩০১ বঙ্গাব্দে পতিতা এক মেয়ের জীবন-কথা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। গল্পটিকে সমগ্র শরৎ সাহিত্যের টীকা-ভাষ্য হিসেবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তিন পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এই গল্পে ক্ষিরোদার অতীত-বর্তমান,মনস্তত্ত্ব তার হৃদয়ের অলিগলি অত্যন্ত নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। গল্পে আমরা দেখি যে–ক্ষীরোদা থেকে, হেমশশীতে একটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং তাতে কুশল কারিগরির প্রয়োগ আছে। নিঃস্ব–রিক্ত পতিতা এই রমনীর সম্পূর্ণ জীবনবৃত্ত ধরে রাখা হয়েছে একটি দীর্ঘ এবং দু'টি ক্ষুদ্র বাক্যে।

> "ক্ষীরোদা তাহার যৌবনের প্রান্তসীমায় যেদিন প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার প্রণয়ী পূর্বরাত্রে তাহার সমস্ত অলংকার ও অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, বাড়িভাড়া দিবে এমন সঞ্চয় নাই–তিন বৎসরের শিশু পুত্রটিকে দুধ আনিয়া খাওয়াইবে এমন সংগতি নাই–যখন সে ভাবিয়া দেখিল, তাহার জীবনের আটত্রিশ বৎসরে সে একটি লোককেও আপনার করিতে পারে নাই, একটি ঘরের প্রান্তেও বাঁচিবার ও মরিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়নাই– যখন তাহার মনে পড়িল, আবার আজ অশ্রুজল মুছিয়া দুই চক্ষে অঞ্জন পরিতে হইবে, অধরে ও কপোলে অলক্তরাগ চিত্রিত করিতে হইবে, জীর্ণ যৌবনকে বিচিত্র ছলনায় আচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে অসীম ধৈর্য-সহকারে নূতন হৃদয়-হরণের জন্য নূতন মায়াপাশ বিস্তার করিতে হইবে– তখন সে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া বারংবার কঠিন মেঝের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিল– সমস্ত দিন অনাহারে মুমূর্ষুর মতো পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দীপহীন গৃহকোণে অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল।"[৪১]

সেই অন্ধকারে এক রস পিপাসু যুবক 'ক্ষীরো' 'ক্ষীরো' শব্দে কড়াঘাত করলে দ্বার খুলে ক্ষীরোদকে ঝাঁটা হাতে বাঘিনীর মতো গর্জন করে ঐ যুবকে তাড়া করেছে । এবং পরে ক্ষুধার জ্বালায় ভগ্নকাতর কণ্ঠে 'মা' মা' করে কান্নারত তিন বছরের সন্তানকে প্রাণপণে বুকে চেপে ধরে কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছে। তারপর প্রতিবেশীরা মৃতশিশুসহ তাকে অচেতন অবস্থায় সেখান থেকে উদ্ধার করেছে। এই হত্যাপরাধে *ম্যাজিস্ট্রেট তাকে সেসনে চালান দিলে কঠিন বিচারে* তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। এইভাবে আমরা এই গল্পের এক দিকের কাহিনী লক্ষ করি । অন্যদিকে এই কাহিনীর মূল খুঁজে পাই– গৃহস্থ ঘরের কিশোরী কন্যা হেমশশীকে ক্ষীরোদাতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে মোহিতমোহনের ক্রীড়নকের ভূমিকায়। হেমশশী

Dhaka University Institutional Repository

কিভাবে ক্ষীরোদার জীবনের দরজায় এসে দাঁড়াল তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। বিধবা তৃপ্তিহীন বঞ্চিত হৃদয়ের অস্পষ্ট প্রণয়-তৃষ্ণাকে পরিপুষ্ট করে, ব্যাকুল-অস্থির করে– মোহিতমোহন তাকে স্বল্পকালের ভোগ-বাসনার সামগ্রী করে চিরদিনের জন্য পতিতাবৃত্তির মতো অত্যন্ত হীনপথে তাকে নিক্ষেপ করেছিল।

> "একদিন গভীর রাত্রে পিতা মাতা ভ্রাতা এবং গৃহ ছাড়িয়া হেমশশী বিনোদচন্দ্র ছদ্দনামধারী মোহিতের সহিত এক গাড়িতে উঠিয়া বসিল। দেবপ্রতিমা যখন তাহার সমস্ত মাটি এবং খড় এবং রাংতার গহনা লইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইল, তখন সে লজ্জায় ধিক্কারে মাটিতে মিশিয়া গেল। ... সে কাঁদিয়া মোহিতের পায়ে ধরিল; বলিল, 'ওগো, পায়ে পড়ি আমাকে আমার বাড়ি রেখে এসো।' মোহিত শশব্যস্ত হইয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। গাড়ি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।...হেম হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া মরিতে লাগিল;সকরুণ অনুনয় সহকারে বলিতে লাগিল,"এখনো রাত আছে। আমার মা, আমার দুটি ভাই,এখনো জাগে নাই; এখনো আমাকে ফিরাইয়া রাখিয়া আইস।" কিন্তু তাহার দেবতা কর্ণপাত করিল না ;...দেবতা এবং স্বর্গ পুনশ্চ আর, একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর জীর্ণ রথে চড়িয়া আর এক পথে প্রস্থান করিলেন– রমণী আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া রহিল।"[৪২]

গল্পে যুবক মোহিত আমাদের কাছে একজন স্বভাব-লম্পট হিসেবে ধরা পড়েছে। হেমশশীর এই ইতিহাস তার বহু ক্রিয়াকলাপের একটি মাত্র। অথচ সে আজ জজ সাহেব, অপরাধীর বিচারের ভার ন্যাস্ত আজ তার হাতে যে পুরুষ যুগে যুগে নারীর প্রতি সীমাহীন -ক্ষমাহীন অন্যায়-অবিচার করে এসেছে, সেই পুরুষ নিজের হাতে নিয়েছে নারীর বিচারের ভার। আহ্নিকতর্পণ করে, শাস্ত্রালোচনা করে, শিশুদের যোগাভ্যাস করায়। যে এখন নিষ্ঠাবান হিন্দু, যার সম্মুখে টাক, পশ্চাতে টিকি। যিনি "এক দিকে তিনি হিন্দু মহিলাগণকে দেবী আখ্যা দিয়া থাকেন, অপর দিকে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার আন্ত রিক অবিশ্বাস। তাঁহার মত এই যে, রমণীগণ কুলবন্ধন ছেদন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, শাসন তিলমাত্র শিথিল হইলেই সমাজপিঞ্জরে একটি কুলনারীও অবশিষ্ট থাকিবে না।"[৪৩]

এ কারণে মোহিত ক্ষীরোদার প্রতি দয়াহীন। "এক কালে তিনি একাধিক রমণীর প্রতি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া আজ রমণীর সর্বপ্রকার সামাজিক অপরাধের কঠিনতম দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন।"[৪৪] ক্ষীরোদার মধ্যে হেমশশীকে আমরা বেঁচে থাকতে দেখি মোহিতের যৌবনকালের চিত্রশোভিত প্রণয়োপহারটিতে। ক্ষীরোদা তার জীবনের একমাত্র স্বপ্নকে ঐ আঙটিতে পুরে রেখেছিল। ক্ষীরোদার ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করবার অল্প সময় আগে, ঘটনাক্রমে সেই আংটিটি মোহিতের হাতে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

"তিনি হঠাৎ যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইলেন, এমনি চমকিয়া উঠিলেন ... তখন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্বেকার আর- একটি অশ্রুসজল প্রীতিসুকোমল সলজ্জশঙ্কিত মুখ মনে পড়িল; সে-মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে । মোহিত আর -একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।"[৪৫]

সাধারণভাবে জজ মোহিত মোহন পুরুষের এবং হেমশশী নারী সমাজের প্রতিনিধিরূপে গল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে। মোহিতের মতোই পুরুষসমাজ যুগে যুগে নারীকে নিজের ইচ্ছা মত ব্যবহার করেছে, তাতে নারী জীবন যত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হোক সেদিকে মোটেও দৃষ্টি দেয়নি। এখানে স্বামীর প্রতি স্ত্রী হেমশশীর ভালোবাসা তার হৃদয়ের সত্যতম অনুভূতিজাত। এমনকি হেমশশী ক্ষিরোদাতে রূপান্তরিত হয়ে যাবার পরেও তা সতেজতা হারায়নি। সমস্ত জীবনযাত্রার মধ্য দিয়েও সে ভোলেনি মোহিতকে। সেদিক থেকে বলা যায়, প্রেমের ক্ষেত্রে ক্ষিরোদা ব্যভিচারী নয়– একজন ছাড়া দু'জন পুরুষ তার জীবনে স্থান পায়নি । সে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করেছে বাধ্য হয়ে,আর্থিক কারণে। একদিন যখন তার কোনো এক প্রণয়ী রাতের অন্ধকারে তাঁর সমস্ত অলঙ্কার অপহরণ করে সরে পড়েছে ,তখন সে প্রবল আর্থিক সমস্যায় পতিতা -জীবনের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণায় শিশুপুত্রসহ আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। এ গল্পে সমকালের সামাজিক অবক্ষয় এবং পুরুষের চারিত্রিক হীনতার যে পরিচয় ফুটে উঠেছে এ গল্পের অন্তরে, তাতে ক্ষিরোদার সমগ্র জীবন কাহিনী পতিতা সম্পর্কে সমাজের চিরাচরিত ধারণার বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ' বলেই মনে হয় আমাদের।

॥

৯. নিশীথে

নিশীথে(১৩০১) গল্পে বিকৃত-মস্তিষ্ক এক ব্যক্তির জীবনকাহিনীর মধ্য দিয়ে মানুষের হৃদয়-রহস্যের একটি দিক উন্মোচিত হয়েছে। এই ব্যক্তি গল্পের নায়ক জমিদার দক্ষিণাচরণবাবু। তিনি একই কথা দুই স্ত্রীকে বলায় একটি সংকটের সৃষ্টি হয়েছে গল্পে। দ্বিতীয় বিবাহের পর প্রথম স্ত্রীর স্মৃতি তাকে উদ্‌বেল ও উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে। প্রথম স্ত্রীকে অমর্যাদা ও বঞ্চনার অনুতাপ - মর্মবেদনাই গল্পটির মূল বিষয়বস্তু। নায়ক বর্তমানে মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির, তার এই মূল সমস্যাটি তার চিকিৎসককে ব্যাখ্যা করেছেন। সেই ব্যাখ্যার পুরো অংশ জুড়েই তার প্রথমা স্ত্রীর স্মৃতিচারণ -"আমার তখন বয়স বেশি ছিল না, সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাই

Dhaka University Institutional Repository

অবিমিশ্র গৃহিণীপনায় মন উঠিত না।"[৪৬] চৈত্রের শুক্লপক্ষের সন্ধ্যায় বকুল তলায় আবেগঘন মোহময় পরিবেশে প্রথমা স্ত্রীকে নিয়ে তার আবেগানুভূতি সম্পর্কে বলেছেন-

> "আমি ধীরে ধীরে কাছের গোড়ায় আসিয়া দুই হস্তে তাহার একটি উত্তপ্ত শীর্ণ হাত তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোনো আপত্তি করিলেন না । কিছু ক্ষণ এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেমন উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিল, আমি বলিয়া উঠিলাম, ' তোমার ভালোবাসা আমি কোনো কালে ভুলিবনা'।"[৪৭]

প্রকৃত পক্ষে এ ধরণের আবেগতাড়িত সংলাপে তার প্রতি স্ত্রীর বিশ্বাস ও নির্ভরতা ক্রমশ কমেছে; স্বামীর অন্তর্লোকের প্রতি বেড়েছে আস্থাহীনতা । তাই সে হেসে ফেলেছে। "সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিত অবিশ্বাস ছিল এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদস্বরূপে একটি কথামাত্র না বলিয়া কেবল তাহার সেই হাসির দ্বারা জানাইলেন, 'কোনো কালে ভুলিবে না, ইহা কখনো সম্ভব নহে এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।"[৪৮] গল্পের নায়ক প্রথমা স্ত্রীর অসুস্থতার সময় ভাবী দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হন । একদিন অন্ধকারে সেই মেয়েটিকে দেখে প্রথমা স্ত্রী স্বামীর কাছে- ও কে । ও কে গো। প্রশ্ন করে তার পরিচয় জানতে চেয়েছিল। তাই আজও যখন তিনি তাঁর নবীনা স্ত্রীকে বলেন 'আমি ভালোবাসি'- সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুভব করেন–"কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নীচে দিয়া, গঙ্গার পূর্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিমপার পর্যন্ত হাহা-হাহা-হাহা করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল।"[৪৯] "অন্ধকারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটিমাত্র দীর্ঘ-শীর্ণ-অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপি চুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'ও কে । ও কে ।ও কে গো।"[৫০]

ভিতরে-বাইরে এই দ্বন্দ্বই দক্ষিণাচরণবাবুর সবচেয়ে বড় চিত্ত-সংকট। আর এই সংকটের পথ ধরেই অভিশপ্ত হয়ে উঠেছে তার জীবন । স্ত্রীর সঙ্গে লুকিয়ে মনোরমার সঙ্গে গোপন অভিসার, মনোরমা অসুস্থা স্ত্রীকে দেখতে এলে- তাকে মিথ্যা পরিচয় দেয়া, পরক্ষণেই তা শোধরানোর চেষ্টা, দক্ষিণাচরণবাবুর এ সমস্ত আচরণ তার দুর্বল ব্যক্তিত্ব ও মানস- বিকৃতিরই পরিচয় বহন করে। প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে তার ছলনা তাকে এক যন্ত্রণাময় শূন্যতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। মনোরমাকে বিয়ে করেও সেই শূন্যতা সে পূরণ করতে পারেননি । সে বলেছে– "আমি যখন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতাম, সে হাসিত না গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোন্‌খানে কী খটকা লাগিয়া গিয়াছিল, আমি কেমন করিয়া বুঝিব"[৫১]

Dhaka University Institutional Repository

এই খটকা মনোরমার একার নয়, দক্ষিণাচরণবাবুর মনেও লেগেছে। এখান থেকেই তার কষ্ট-যন্ত্রণা শুরু, মদের নেশায় ভুলবার অপচেষ্টা, অসুখের সূত্রপাত। অসুস্থ স্ত্রীর সেবা করতে করতে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত দক্ষিণাচরণ জৈবিক নিয়মেই মনোরমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। "মরুভূমির মধ্যে আর একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্যন্ত তখন চোখের সামনে কূলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল ঢলঢল করিতে লাগিল। মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।"[৫২] আর পারেনি বলেই প্রথমা স্ত্রীকে দেয়া ভালোবাসার স্পর্ধিত- শপথ ভেঙে, স্ত্রী মনোরমা জীবিত থাকা অবস্থাই সে অন্য নারীকে ভালোবেসেছেন এবং স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বিয়ে করেছে। ফলে তার জীবনের সুর এলোমেলো বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। সেই বিপর্যয়ের ঝড়ে কেবল তার দাম্পত্য- সুখ নয়, জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি বিপর্যস্ত হয়েছে, তার জীবনের সমস্ত আলো যেনো নিভে গিয়ে সেখানে চির অন্ধকার নেমে এসেছে। আজ বস্তু জগতের সমস্ত চেনা বস্তুর মধ্যে,প্রকৃতির পরিবর্তনের মধ্যে, তার সেই প্রথমাই যেনো কথা কয়ে উঠে । বর্তমান স্ত্রী মনোরমার জন্য তাঁর প্রেম, তাঁর দিনের বেলার কর্মসংসার সবই রাতের বুকে সেই প্রথমার অশরীরী – অভিসারে কেমন মিথ্যা মায়া প্রতিপন্ন হ'তে থাকে। গল্পটিতে অতিপ্রাকৃতিক শিহরণ এবং হিমশীতল অনুভূতির প্রকাশ আছে।

১০. মানভঞ্জন

'মানভঞ্জন'(১৩০২)গল্পটিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের নাগরিক কলকাতার একটি বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। তবে সমাজ পটভূমিতে এক নারীর দাম্পত্য সংসার –জীবনকে তুলে ধরাই এর মূল উদ্দেশ্য। এ গল্পে প্রতিফলিত দাম্পত্য জীবনটি হচ্ছে গিরিবালা ও গোপীকানাথ- এর দাম্পত্য জীবন। এতে এক দিকে গিরিবালার স্বামী গোপীকানাথ স্ত্রীর সমস্ত আয়োজন বিনয়-অনুরোধ উপেক্ষা করে রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে গিরিবালা স্বামীর এহেন অপকর্মের প্রতিবাদে প্রতিশোধ নেবার মানসে রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী হিসেবে যোগ দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কারণটি প্রথমটির পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি । পুরুষের অন্যায়, অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে নারী ক্রমশ প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে তৎকালের সমাজ পরিবর্তনে। এবং রুখে দাঁড়িয়েছে পুরুষের হীন দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে। নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি সমকালের শিল্প সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'মানভঞ্জন' গল্পে গিরিবালারকে সমস্ত নারী সমাজের প্রতিনিধিরূপে সেই ব্যাপারটি ঘটিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাই দাম্পত্য সংসার জীবনের সংকট–সমস্যা ও অসুখ– অশান্তির মূলে গোপীকানাথের স্ত্রীর প্রতি চরম অবহেলা – অমর্যাদাই বিশেষ ভাবে দায়ী । গল্পের শুরুতেই তৎকালীন বাবু সমাজের শ্রেণী চরিত্রটি সামনে রেখে গিরিবালার সৌন্দর্য স্পষ্ট হয়েছে।

– "রমানাথ শীলের ত্রিতল অট্টালিকায় সর্বোচ্চ তলের ঘরে গোপীনাথ শীলের স্ত্রী গিরিবালা বাস করে। শয়নকক্ষের দক্ষিণদ্বারের সম্মুখে ফুলের টবে গুটিকতক বেলফুল এবং গোলাপ ফুল গাছ – ছাতটি উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা – বহির্দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রাচীরের মাঝে মাঝে একটি করিয়া ইঁট ফাঁক দেওয়া আছে। শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশ– বিশিষ্ট বিলাতি নারীমূর্তির বাধাঁনো এন্‌গ্রেভিং টাঙানো রহিয়াছে ; কিন্তু প্রবেশদ্বারের সম্মুখবর্তী বৃহৎ আয়নার উপরে ষোড়শী গৃহস্বামিনীর যে প্রতিবিম্বটি পড়ে তাহা দেয়ালের কোনো ছবি অপেক্ষা সৌন্দর্যে ন্যূন নহে। গিরিবালার সৌন্দর্য অকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়,বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গের চেতনার ন্যায়, একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, ইহাকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।....মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া পড়িয়া যায়, নবযৌবন এবং নবীন সৌন্দর্য তাহার সর্বাঙ্গে তেমনি ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে –তাহার বসনে ভূষণে, গমনে তাহার বাহুর বিক্ষেপে, তাহার গ্রীবার ভঙ্গিতে, তাহার চঞ্চল চরণের উদ্দাম ছন্দে, নূপুরনিক্বণে, কঙ্কণের কিঙ্কিণীতে, তরল হাস্যে, ক্ষিপ্র ভাষায়, উজ্জ্বল কটাক্ষে একেবারে উচ্ছৃঙ্খলভাবে উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিতেছে।"[৫৩]

এভাবে সংযমের সীমানা ছেঁড়া উচ্ছল এই সৌন্দর্যের যে ছবি গল্পকার এখানে এঁকেছেন বস্তুতপক্ষে গিরিবালার সৌন্দর্যের এই ছবি গিরিবালার চরিত্রেরও ছবি। স্বাভাবিক সংসার জীবনের অপ্রাপ্তির ফলেই তার মধ্যে স্বাভাবিক সংযমের অভাব। জীবনের অপ্রাপ্তির জ্বালা তার মধ্যে যে চাঞ্চল্য, উদ্দামতা নিজেকে প্রকাশ করার উদগ্র বাসনার জন্ম দিয়েছে তা তার 'গমনে', 'তরল হাস্যে', 'উজ্জ্বল কটাক্ষে' প্রকাশিত। গিরিবালা নিজের যৌবনের মদিরতায় সে নিজেই নেশাগ্রস্ত। সে হঠাৎ গাছ হতে পাতা ছিড়ে, বালার ছন্দে বাতাসে উড়িয়ে দেয়। অকারণে মাটির ঢেলা ছুঁড়া-ছুঁড়ি করে, সে নিজের রূপ সৌন্দর্য সম্পর্কে প্রশংসা শুনতে পছন্দ করে ।কিন্তু তার স্বামী দেবতার কাছ থেকে এসবের কোনো মূল্য ও মূল্যায়ন সে পায়নি । অতিমাত্রায় রূপসচেতন আত্মরতিমগ্না হয়েও গিরিবালা তার স্বামীকে আয়ত্ত্ব করতে পারেনি।

> "সে নিজে জানিত, বিধাতা তাহার হস্তে রাজদণ্ড দিযাছেন–সে জানিত, প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া যে বৃহৎ জগৎখানি দেখা যাইতেছে, সেই জগৎটিকে সে কটাক্ষে জয় করিয়া আসিতে পারে – অথচ বিশ্বসংসারের মধ্যে একটি মানুষকেও সে বন্দী করিতে পারে নাই।"[৫৪]

Dhaka University Institutional Repository

এই আত্মবিশ্বাস তাকে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। সে নিজেকে তুচ্ছ সামান্য নারী হিসেবে দেখতে চায়নি, বর্হিজগতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দেখতে চেয়েছে। গোপীনাথের অমার্জিত অভদ্র আচরণের কাছে সে হার মানেনি। কিছুতেই চাবি না দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর স্বভাবের কাঠিন্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বামীর নিরেট অপমানে সে তৎকালের নারীর স্বাভাবিক আচরণ না করে, আত্মহত্যা না করে আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদ অনুভব করেছে, সংসার ছেড়েছে, রঙ্গিন-রঙ্গমঞ্চের দিকে পা বাড়িয়েছে। গিরিবালার পরিণতির জন্য দায়ী তার স্বামীর আচরণ এবং সেই সঙ্গে তার নিজের স্বভাবও। তার মধ্যে আত্মপ্রকাশের যে তীব্র বাসনা ছিল, গোপীনাথের আচরণ সে বাসনার গোড়ায় ইন্ধন জুগিয়েছে। প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনের মধ্যে যে হীনতা রয়েছে গিরিবালা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। অপমান-অবহেলা সে নিঃশব্দে উপেক্ষা করেনি,স্পষ্টরূপে তার প্রতিকার করতে সচেষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে আত্মসম্মানজ্ঞান দৃঢ় বলেই স্বামীর পদাঘাত শেষ পর্যন্ত সে স্বামীকেই ফিরিয়ে দিয়েছে। হৃদয়ের প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিজীবনের জটিলতায় শেষ পর্যন্ত সে মুক্তি খুঁজেছে থিয়েটারের রঙিন দুনিয়ায়। কাজেই- 'মানভঞ্জন' 'গল্পের গিরিবালা-চরিত্র সেকালে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো লেখনীতেই সম্ভব ছিল না। ঘরের কুলবধূ স্বামীদেবতার কোনো আচরণেরই কোনো প্রকারের প্রতিবাদ করার অধিকার পাবে না – এমন কুসংস্কারপূর্ণ চিন্তার বিরুদ্ধে সেকালের ভীষণতম প্রতিবাদ গিরিবালা চরিত্র। গিরিবালা, এমন কি প্রতিবাদ বঙ্কিম-রচিত আদর্শের বিরুদ্ধেও।"[৫৫]

১১. মণিহারা

"মণিহারা'(১৩০১)গল্প স্ত্রীবিয়োগবিধুর এক স্বামীর মনোবিকার-জাত ঘটনার বর্ণনা। কাহিনীটি এক অস্বাভাবিক স্ত্রীর প্রতি এক স্বামীর অহেতুক স্বপ্নতাড়িত হবার কাহিনী। এতে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে একটি অসুখী দাম্পত্য-সংসারের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পের প্রধান দুই চরিত্রের এক জন মণিমালিকা, 'সেই স্ত্রী' যে – "স্ত্রীটি বেশি কথাবার্তা কহিত না, পাড়াপ্রতিবেশিনীদের সঙ্গেও তাহার মেলামেশা বেশি ছিল না ; ব্রত উপলক্ষ করিয়া দুটো ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো, বৈষ্ণবীকে দুটো পয়সা ভিক্ষা দেওয়া কখনো তাহার দ্বারা ঘটে নাই। তাহার হাতে কোনো জিনিস নষ্ট হয় না; কেবল স্বামীর আদরগুলো ছাড়া আর যাহা পাইয়াছে সমস্তই জমা করিয়া রাখিয়াছে।.... সে নিজের অপরূপ যৌবনশ্রী হইতেও যেন লেশমাত্র অপব্যয় ঘটিতে দেয় নাই। লোকে বলে তাহার চব্বিশ বৎসর বয়সের সময়ও তাহাকে চৌদ্দ বৎসরের মতো কাঁচা দেখিতে ছিল। যাহাদের হৃদপিণ্ড বরফের পিণ্ড, যাহাদের বুকের মধ্যে ভালোবাসার জ্বালাযন্ত্রণা স্থান পায় না, তাহারা বোধ করি সুদীর্ঘকাল তাজা থাকে, তাহারা কৃপণের মতো অন্তরে বাহিরে আপনাকে জমাইয়া রাখিতে পারে।"[৫৬] অন্যজন ফনিভূষণ, 'সেই স্বামী' যিনি বলতেন–

Dhaka University Institutional Repository

"স্ত্রী ভালোবাসা ঠিক কতটা পাইলাম, ঠিক কতটুকু কম পড়িল, অতি সূক্ষ্ম নিক্তি ধরিয়া তাহা অহরহ তৌল করিতে বসা কি পুরুষ মানুষের কর্ম ! স্ত্রী আপনার কাজ করুক, আমি আপনার কাজ করি, ঘরের মোটা হিসেবটা তো এই। অব্যক্তের মধ্যে কতটা ব্যক্ত, ভাবের মধ্যে কতটুকু অভাব, সুস্পষ্টের মধ্যেও কী পরিমাণ ইঙ্গিত, অণুপরমাণুর মধ্যে কতটা বিপুলতা – ভালোবাসাবাসির তত সুসূক্ষ্ম বোধশক্তি বিধাতা পুরুষমানুষকে দেন নাই, দিবার প্রয়োজন হয় নাই। পুরুষমানুষের তিলপরিমাণ অনুরাগ-বিরাগের লক্ষণ লইয়া মেয়েরা বটে ওজন করিতে বসে। কথার মধ্য হইতে আসল ভঙ্গীটুকু এবং ভঙ্গীর মধ্য হইতে আসল কথাটুকু চিরিয়া চিরিয়া চুনিয়া চুনিয়া বাহির করিতে থাকে। কারণ, পুরুষের ভালোবাসাই মেয়েদের বল,তাহাদের জীবনব্যবসায়ের মূলধন। ইহার হাওয়ার গতিক লক্ষ্য করিয়া ঠিক সময় ঠিকমত পাল ঘুরাইতে পারিলে তবেই তাহাদের তরণী তরিয়া যায়। এইজন্যই বিধাতা ভালোবাসা-মান যন্ত্রটি মেয়েদের হৃদয়ের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছেন, পুরুষদের দেন নাই।"[৫৭]

সাধারণভাবে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঔচিত্যের বিপর্যয়ের এই পটভূমিতেই বিশেষভাবে মণিমালিকা চরিত্রটি বিশ্লেষণযোগ্য। গল্পে আমরা ফনিভূষণকে একজন কলেজে পড়া ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক মানুষ হিসেবে পাই। সেকালে নবযুবাদের মতো সেও স্ত্রীকে প্রণয়িনীর মর্যাদা দিয়েছে। তাঁর ভিতরেও সেই রোমান্টিক বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছে। ফলে তাঁর মধ্যে স্বামীত্বের দখলদারি মনোভাব গৌণ হয়ে প্রণয়ীর রোমান্টিসিজমই মুখ্যরূপে ক্রিয়াশীল ছিল। তাই স্বামীত্বের দাপট পরিত্যাগ করে প্রণয়ীরূপে স্ত্রীকে পেতে চেয়েছে সে। তাঁর চরম বিপদের দিনে স্ত্রীর কাছে গহনাগুলো চেয়ে 'একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত' পেয়েও সে প্রতিবাদ বা স্ত্রীকে পাল্টা আঘাত করেনি । কারণ -'পুরুষোচিত বর্বরতা লেশমাত্র তাহার ছিল না।'জোর করে কেড়ে নেবার ক্ষেত্রে যে আন্তরিক ক্ষোভও সে চেপে যায়। কারণ সে তাঁর স্ত্রীকে ভালোবাসার কাব্যের নায়কের মতো ভালোবাসে। 'স্ত্রী যদি স্বেচ্ছাপূর্বক বিশ্বাস করিয়া আমাকে গহনা না দেয় তবে তাহা আমি কাড়িয়া লইতে পারি না' বলে সে অন্যের ভৎসনায় জবাব দেয়।ফনিভূষণের এরূপ আচরণের মধ্যে যে প্রেমিক মনটি ছিল মনিমালিকা সে মন বুঝতে পারেনি , বুঝার চেষ্টাও করেনি। তার অশিক্ষিত মানসিকতায় ও স্থূল রুচিতে ফণিভূষণ সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়েনি।

"সংসারে সাধারণত স্ত্রীকে স্বামী যতটা চেনে,স্বামীকে স্ত্রী তাহার চেয়ে অনেক বেশি চেনে, কিন্তু স্বামীর প্রকৃতি যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় তবে স্ত্রীর অনুবিক্ষণে তাহার সমস্তটা ধরা পড়ে না। আমাদের ফণিভূষণকে ফণিভূষণের স্ত্রী ঠিক বুঝিত না।"[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

এসেন্স ডিক্যান্টার শোভিত বাপের বাড়ি থেকে যে সংস্কার নিয়ে সে এসেছিল সেই সংস্কারে পুরুষমানুষকে সে হয় বর্বর নয় নির্বোধ অথবা অন্ধ বলেই জানতো। এর বাইরে এসে ফণিভূষণের সূক্ষ্ম রোমান্টিসিজম্ মনকে বোঝার মতো শিক্ষা ও ক্ষমতা কোনটাই তার ছিল না। স্বামীকে বশ করার কতগুলি স্থূলবিদ্যা লৌকিক কামশাস্ত্রের বহুল প্রচলিত কিছু উপকরণ শিখে এসেছিল তার বাপের বাড়ি থেকে। কিন্তু যখন সে 'বিনা চেষ্টায় আদর ,বিনা অশ্রুবর্ষণে ঢাকাই শাড়ি' বাজুবন্ধ ইত্যাদি পেত তখন মাতামহীদের কাছ থেকে শিখে আসা তার সেই কৌশল বিদ্যা সমস্তই একেবারে বৃথা হয়ে গিয়েছিল। ফলে তার নারীপ্রকৃতি ও স্বামীকে করায়াত্ত করার রতিকৌশল একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়েছিল। ক্রমশ বরফ শীতল হয়ে এসেছিল। যে বিশেষ এবং প্রবল যৌনপ্রবৃত্তি পুরুষের ক্ষমতার উৎস, তার চর্চার মধ্য দিয়েই পুরুষের আধিপত্য বজায় থাকে এবং পুরুষের মধ্যে এই ক্ষমতার স্বভাবিক দাপটই নারীর স্ত্রী প্রবৃত্তিকে সচল রাখে। ফণিভূষণের রোমান্টিসিজমের মধ্যে সেই ক্ষমতার পরিচয় পায়নি মণিমালিকা।ফলে তার হৃদয়ের শীতলতা ভেঙে চুরে চুরমার করার জন্য পুরুষের যতটা বর্বরতা-নির্মমতা দরকার ছিল ফণিভূষণের মধ্যে তার অভাবে মণিমালিকার স্ত্রী প্রবৃত্তি ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। কেননা

> "যাহার যা প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা সেটার চর্চা না করিলে সে সুখী হয় না। শিঙে শান দিবার জন্য হরিণ শক্ত গাছের গুঁড়ি খোঁজে, কলা গাছে তাহার শিং ঘষিবার সুখ হয় না। নর-নারীর ভেদ হইয়া অবধি স্ত্রীলোক দুরন্ত পুরুষকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বশ করিবারবিদ্যা চর্চা করিয়া আসিতেছে। যে স্বামী আপনি বশ হইয়া থাকে তাহার স্ত্রী বেচারা একেবারেই বেকার ।"[৫৯]

মণিমালিকার স্বভাবে যে স্বাভাবিক শীতলতা ছিল বিবাহিত জীবনের কামশীলতা তাকে একেবারেই নির্লিপ্ত করে তুলেছিল। এজন্যই "ফণিভূষণের হৃদয় কী-যেন-কী নামক একটা দুঃসাধ্য উৎপাত অনুভব করিত। স্ত্রীর কোনো দোষ ছিল না, কোনো ভ্রম ছিল না, তবু স্বামীর কোনো সুখ ছিল না। সে তাহার সহধর্মিনীর শূন্যগহবর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া কেবলই হীরামুক্তার গহনা ঢালিত কিন্তু এগুলো পড়িত গিয়া লোহার সিন্দুকে, হৃদয় শূন্যই থাকিত।"[৬০] মণিমালিকা ফণিভূষণের হৃদয় অনুভব করেনি, কারণ মানুষের হৃদয় অপেক্ষা বস্তুর মূল্যই তার কাছে অধিকতর মনে হয়েছে। সন্তানহীনা মণিমালিকার কাছে পুত্রের তুলনায় সোনা মাণিক অধিক প্রিয়তম, কারণ তা রূপকমাত্র নয়, তা প্রকৃতই সোনামাণিক। স্বামীর ভালোবাসা জড়ানো অলংকার তার হাতে পড়েই নিছক জড় বস্তুতে পরিণত হয়েছে।' স্বামী দেয় ভালোবাসা, পত্নী জমায় মৃতসোনা।' আমরা তাকে একবারের জন্যও স্বামীর দেয়া অলংকারে সুজ্জিত হতে দেখি না, দেখি না ভাব করতেও। তার মধ্যে ভাবেরও দারুণ অভাব। তার হৃদয় হৃদপিণ্ড সমস্তই

Dhaka University Institutional Repository

বরফ, বস্তুবাৎসল্যের তীব্রতায় তার সমস্ত জীবনই যেনো কঠিন ভাবে হিমায়িত। গল্পে আমরা যে মৃত্যু রহস্য জানতে ফণিভূষণকে আগ্রহী হয়ে উঠতে দেখেছি, সেই মৃত্যু রহস্য তার কাছে এক গভীর সত্য প্রকাশ করে দিয়েছে। সে জানতে পেরেছে মণিমালিকা চিরদিনই মৃত। সেই অনুভূতিহীন মৃত অমানবীর সঙ্গেই সে দীর্ঘদিন দাম্পত্য জীবন যাপন করেছে।

১২. উদ্ধার

'উদ্ধার'(১৩০৫) গল্পটিতে একটি দম্পতির স্ত্রীর আত্মমর্যাদার পাশাপাশি স্বামীর হীনমন্যতা ও লাম্পট্য মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতে এক দিকে নারীর উজ্জ্বল সম্ভাবনা ব্যাহত হয়েছে, অন্য দিকে উন্মোচিত হয়েছে সমাজের কদর্যরূপ। নির্যাতিত বহু নারীকে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে দেখেছি আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের গল্পে। উদ্ধার গল্পে গৌরীও সেই রকম একটি প্রতিবাদী চরিত্র। তবে মানভঞ্জন গল্পের গিরিবালার মতো অস্তিত্ববান হয়ে উঠতে পারেনি সে। গিরিবালা নাট্যশিল্পের সাথে নিজেকে জড়িয়ে নিবিড় চর্চার মধ্য দিয়ে মুক্তির সাধ লাভ করেছিল। কিন্তু গৌরীর জীবনের দীনতা কাটানোর তেমন আয়োজন নেই এখানে। বরং নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে সে। সম্ভাবনাময় জীবনের আনন্দময় দিকটি অন্বিষ্ট হয়ে উঠেনি তার কাছে। ফলে প্রবল আত্মচেতনা থাকা সত্ত্বেও তাকে আমরা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে দেখিনা। গিরিবালা স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করে বাঁচার যে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল – তাতে তাঁর সম্মান ও স্বীকৃতি দু'ই ছিলো। কিন্তু গৌরীর ক্ষেত্রে তা হয়নি, যেখানে সে আশ্রয় সন্ধান করেছে সেখানে-গৈরিক বসনের অন্তরালে অবস্থানরত রীপুর হাত থেকে নিস্কৃতি পায়নি সে। "গুরুদেব, অপমানিত সংসার হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া চলো, তোমার সেবাব্রতে আমি জীবন উৎসর্গ করিব"[৬১] বলে গৌরী যার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল,তাকেই সে দেখল'চোরের মতো পুষ্করিণীর তটে' ঘুরে বেড়াতে। তাঁর গুরু পরমানন্দে এহেন অধঃপতনে সদ্য বিধবা গৌরীর হৃদয়কে নাড়িয়ে দিয়ে অন্য পথে ধাবিত করেছে সেই পথের দাবী মেটাতে গিয়ে বিষপানে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। গল্পে গৌরীর স্বামী পরেশ তাঁর স্ত্রী গৌরীকে সন্দেহ করছে, সে ধনী গৃহে অতি আদরে লালিত সুন্দরীকন্যা বলে। এ কারণেই সে অসময়ে আদালত থেকে বাড়িতে চলে আসতো, স্ত্রী বিশেষ অসুবিধায় পড়ে যে চাকরকে রাখার জন্য বেশী আগ্রহ দেখাত, পরেশ এক মুহূর্ত তাকে স্থান দিত না। দাসীকে ডেকে নানা রকম সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসাবাদ করত; অফিসে যাওয়ার সময় গৌরীকে ঘরে আটকে রেখে যেত। ফলে গৌরী "অপমানে আহত সিংহিনীর ন্যায় অন্তরে অন্তরে উদ্দীপ্ত হইতে লাগিলেন এবং এই উন্মত্ত সন্দেহ দম্পতির মাঝখানে

Dhaka University Institutional Repository

প্রলয়খড়্গের মতো পড়িয়া উভয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল।"[৬২] স্বামীর এহেন মনোবিকার গৌরীর মনের মধ্যে বিদ্রোহের তুমুল ঝড় উঠেছিল। ধর্মাশ্রয়ের মধ্যদিয়ে তাঁর সে বিদ্রোহ প্রকাশিত হয়েছে। "এইরূপ স্বামীসুখ হইতে প্রতিহত হইয়া পুত্রহীনা তরুণী ধর্মে মন দিল। হরিসভার নবীন প্রচারক ব্রহ্মচারী পরমানন্দস্বামীকে ডাকিয়া মন্ত্র লইল এবং তাঁহার নিকট ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিতে আরম্ভ করিল। নারীহৃদয়ের সমস্ত ব্যর্থ স্নেহপ্রেম কেবল ভক্তির–আকারে পুঞ্জিভূত হইয়া গুরুদেবের পদতলে সমর্পিত হইল।"[৬৩] এই কারণে উদ্ধার গল্পটিকে আমার কাছে এক প্রতিবাদী নারীর ব্যর্থতার ছায়াচিত্র বলে মনে হয়। আর সেই ছায়ায় একটা সম্ভাবনাময় দম্পতির সমস্ত আলো যেন ম্লান হয়ে একেবারে নিভে গেছে।

১৩. নষ্টনীড়

কুড়িটি ছোট পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত, ৪৪ পৃষ্ঠার- বড় আকারের ছোটগল্প 'নষ্টনীড়'। গল্পটি পদ্মা-প্রকৃতির প্রভাব মুক্ত, এক আধুনিক নারীর হৃদয়বেদনার গল্প। গল্পেটিতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষকে নির্বিশেষে নয়, বিশেষের সীমাতেই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত থেকেছেন। ফলে এতে– হৃদয়াবেগের চেয়ে মনোবিকল, গতির চেয়ে বিবৃতি, চলমানতার চেয়ে বিশ্লেষণ বেশি পরিলক্ষিত হয়। এবং তা একটি অসামাজিক প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে নর-নারীর হৃদয়লীলাকে অনুধাবন করবার চমৎকার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পে মূলত উচ্চবিত্ত পরিবারের প্রতিদিনকার ঘটনাবলী স্থান পেয়েছে, এবং তাতে অতি নাটকীয়তা বা অস্বাভাবিকতা নেই। কাহিনীতে -সংসারের ভিতরে চারু-ভূপতি, বাইরে উমাপতি-মন্দা, অমল এই পাঁচ চরিত্র । উমাপতি-মন্দা নবম এবং অমলকে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত দেখেছি আমরা। চারুলতা-ভূপতি থেকেছে গল্পের শেষাবধি। সেই সঙ্গে গল্পের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত চারুলতার মনে অমলের বিমল উপস্থিতি আমাদের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

> "নিজের অসহ্য কষ্টে ও চাঞ্চল্যে চারু নিজে বিস্মিত। মনোবেদনার অবিশ্রাম পীড়নে তাহার ভয় হইল। নিজে কেবলই প্রশ্ন করিতে লাগিল, কেন। এত কষ্ট কেন হইতেছে।অমল আমার এতই কী যে তাহার জন্য এত দুঃখ ভোগ করিব। আমার কী হইল, এতদিন পরে আমার এ কী হইল।...কেবলই প্রশ্ন করে এবং আশ্চর্য হয়,কিন্তু দুঃখের কোনো উপশম হয় না। অমলের স্মৃতিতে তাহার অন্তর বাহির এমনি পরিব্যাপ্ত যে কোথাও সে পালাইবার স্থান পায়না।"[৬৪]

কাহিনীতে আমরা লক্ষ করেছি যে- ' অমল-চারু-ভূপতি এই মূল আবর্তের মধ্যে মন্দা -অমল-চারুতে মিলে অন্তবৃত্ত তৈরি হয়েছে। মন্দার ভূমিকায় গুরুত্ব আছে। চারুর আকাশচারী প্রণয়কে ঈর্ষা-দ্বেষে, সন্দেহ-তিক্ততায় মানবিক বাস্তবতায় নামিয়ে এনে সে বিদায় নিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে 'উমাপদ'ভূপতির বর্হিমুখী আদর্শকে তাতিয়ে তুলে প্রবল করেছে এবং বড় আঘাতে বিপর্যস্ত করে তাকে গৃহমুখী করে বিদায় নিয়েছে। কাহিনীতে 'উমাপদ-মন্দার' দাম্পত্যবন্ধন একটা তুচ্ছ খবর বলেই মনে হয়েছে আমাদের। 'গল্পে কামনার স্পর্শহীন, দেহভাবনামুক্ত প্রেমের যে শুষ্ক রূপটি আমরা প্রত্যক্ষ করি তা রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কল্পনার রঙে আঁকা, অমল-চারুর মনের ভিতরের দেয়ালে লাগানো ছবির মতো মনে হয়। যেখানে কোনো ফাঁক নেই, নেই প্রকাশের সহজ সুযোগও।' মানুষ অলক্ষ্যে, নিজের অজান্তে অন্যের প্রতি ধাবিত হয়ে থাকে। অমলের প্রতি চারুলতার আকৃষ্টতাও সেই পর্যায়ের। চারুলতা বুঝতেই পারেনি কখন সে জীবনের নানা বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে অমলের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েছে। বিশেষ করে বাগান পরিকল্পনা ও সাহিত্যচর্চার প্রসঙ্গে-অনুসঙ্গে তাঁদের দু'জনের বাইরের এবং ভিতরের দূরত্ব কমেছে । কেননা -"তাহাদের সমস্ত সংকল্পগুলির প্রধান সুখ এবং গৌরব এই ছিল যে, সেগুলি তাহাদের দুজনের মধ্যেই আবদ্ধ।"[৬৫] আমরা জানি যে, নারী জীবনের সবটুকু বিকাশ সংসারে স্বামী-সন্তান নিয়ে। সেই স্বামী-সন্তানও যে হতভাগিনী পায়নি, সে তার জীবনের শূন্যতাকে ভ'রে নেবে কি দিয়ে ? এই সমস্যা ছিল 'মানভঞ্জন' গল্পে গিরিবালার জীবনেও। ধনীগৃহে চারুলতা একান্ত কর্মহীন।

> "ফল পরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টা শূন্য দীর্ঘ দিন-রাত্রির একমাত্র কাজ ছিল।"[৬৬]

চারুলতা তার সুদীর্ঘ অবসর মুহূর্তগুলি পূর্ণ করে নিয়েছিল অমলের নানা আবদার মেটাবার ভার নিয়ে। দু'জনে পাশাপাশি চলতে চলতে কখন যে চারুলতার মনে অমলের প্রতি দুর্বলতার জন্ম হয়েছে সেকথা সে নিজেও জানতে পারেনি। আর যখন তা পারলো তখন অমল তাঁর শূন্য জীবন থেকে দূরে সরে গেছে। সেই শূন্য জীবনে তাঁর শুধু একটি কথাই বলবার আছে-

> "অমল, তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই। একদিনও না, একদণ্ডও না । আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতি দিন তোমার পূজা করিব।"[৬৭]

১৪.দিদি

'দিদি'(১৮৯৪) দাম্পত্য - সংসার জীবনের টানাপোড়েনের গল্প। গল্পে প্রথমে শশীকলা জয়গোপালের দাম্পত্যজীবন ও পরে পিতৃ-মাতৃহীন সন্তান নীলমণির লালন পালন। শশীকলা প্রবাসী স্বামীর বিরহে অস্থির। তাঁর কেবলই মনে হয় "এইবার যখন স্বামীকে নিকটে পাইব তখন জীবনকে নীরস এবং বসন্ত

Dhaka University Institutional Repository

কে নিস্ফল হইতে দিব না।"[৬৮] সেই স্বামীর সঙ্গে শশীকলার সম্পর্কেও টানাপোড়েন শুরু হয় দিদি হিসেবে অসহায় শিশু নীলমণির দায়িত্ব নেয়ার কারণে। কালিপ্রসন্নের একমাত্র কন্যার জামাতা হিসেবে জয়গোপাল আশা করেছিল সে-ই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে। কিন্তু শ্যালক নীলমণি 'সমস্ত আশাভরসা যখন অপহরণ করিয়া বসিল, তখন সে আসামের চা- বাগানে এক চাকরি লইল।"[৬৯] ফলে টানাপোড়ন শুরু হয়ে গেল স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্কের মধ্যে। "ভালোবাসার ভাবগতিক মেয়েরা খুব চট্ করিয়া বোঝে। শশী অবিলম্বেই বুঝিল, জয়গোপাল নীলমণির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত নহে। তখন ভাইটিকে সে বিশেষ সাবধানে আড়াল করিয়া রাখিত–স্বামীর স্নেহহীন বিরাগদৃষ্টি হইতে তাহাকে তফাতে তফাতে রাখিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে ছেলেটি তাহার গোপন যত্নের ধন, তাহার একলার স্নেহের সামগ্রী হইয়া উঠিল।"[৭০] তাদের দু'জনের মধ্যে দেখা দিল নিরব দ্বন্দ্ব,সংঘাত। "শশী নীলমণিকে যতই ভালোবাসে জয়গোপাল নীলমণির প্রতি ততই বিরক্ত হয়, আবার জয়গোপাল নীলমণির প্রতি যতই বিরাগ প্রকাশ করে শশী তাহাকে ততই স্নেহসুধায় অভিষিক্ত করিয়া দিতে থাকে।"[৭১] একদিকে শশীকলা ভাইকে রক্ষার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে, অন্যদিকে স্বামী জয়গোপাল তার শ্যালকের সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে পড়ে। স্বামীর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা ভেবে শশীর দাম্পত্য জীবনের মধুময়তা তার কাছে ম্লান হয়ে আসে,সে স্বামীর অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শুরু করে। জয়গোপালের 'অগ্নিমূর্তি' চেহারার সামনে সে নির্ভয়ে বলে ওঠে–

> "আমাকে যদি কাটিয়া ফেল তবু আমি এখন ফিরিব না; তোমরা আমার নীলমণিকে মারিয়া ফেলিতে চাও; উহার মা নাই, বাপ নাই, আমি ছাড়া উহার আর কেহ নাই, আমি উহাকে রক্ষা করিব।"[৭২]

শশীর এই হৃদয় বেদনাই তার স্বামীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম করে তুলেছে। যে সংসারকে সে পরম আশ্রয় বলে জেনে এসেছে, বাস্তবে তা যে এক নিষ্ঠুর ফাঁদ সেটা সে বুঝতে পেরেছে। তাই সে স্বামীর অন্যায় ষড়যন্ত্রের প্রতিকার করতে প্রতিবাদ করেছে। জয়গোপালের হিংস্রতা থেকে নাবালক ভাইকে রক্ষা করবার শেষ উপায় হিসেবে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে নীলমণিকে তুলে দিয়েছে। "সাহেব, তোমার হাতে আমার এই অনাথ ভাইটিকে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে রক্ষা করো।"[৭৩] তারপর স্বামীর কাছে ফিরে গেলেও আপোষ করেনি শশী। অনাথ ভাইয়ের প্রতি স্নেহের বন্ধন আলগা হয়ে যাবার পর জয়গোপালের সাথে দাম্পত্য সম্পর্কও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে তার। তবু স্বামীর হীন লাম্পট্যকে প্রশ্রয় দেয়নি সে। ফলে স্বামীর ক্রোধানলে পড়ে শেষ পর্যন্ত তাকে জীবন দিতে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর এ প্রতিবাদ ও প্রাণধর্মীতা তাকে তৎকালের নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে নিশ্চয়ই।

১৫. স্ত্রীর পত্র

'স্ত্রীর পত্র ' গল্পটি নারীব্যক্তিত্বের মুক্তির প্রমাণপত্র। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থান এবং তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মোপলব্ধির দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে গল্পটিতে। নর-নারীর সম্পর্কের একটু ভিন্ন রকম মূল্য ও মূল্যায়ন আছে এতে। "মৃণালের যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এ গল্পের বিষয় তা এদেশের ফিউডাল সমাজের নারীর মর্যাদা ও ভূমিকা নিয়ে একটা সামগ্রিক পুর্নমূল্যায়ন।"[৭৪] মৃণালের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সমকালের সমাজ ব্যবস্থায় কখনো বেদনায়, কখনো ব্যঙ্গে শাণিত হয়ে উঠেছে। এর পিছনে তাঁর স্বাধীন চিন্তা শক্তির প্রভাব এবং তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ মন ছিল সবচেয়ে বেশি স্বকীয়। স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধিতেই নারীর পারিবারিক অবস্থানটি সে আচ্ করতে পেরেছে। গল্পটি যে সময়ের, সেই সময়টিতে নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ শুরু হয়ে গেছে। তা কেবল ভিতরে ভিতরে নয়, বাইরেও ।

> "আমার যে বুদ্ধি আছে সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিঁকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্য বিষম উদ্‌বিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চলতে হবে সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। কিন্তু, কী করব বলো। তোমাদের ঘরে বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে।"[৭৫]

অথচ সেকালে নারীর বুদ্ধিবৃত্তি ও কলাবৃত্তির মূল্য-মর্যাদা ছিল উপেক্ষিত। বিয়ের আগে মৃণালকে পাত্রপক্ষের সামনে হাজিরের ঘটনা বর্ণনায় বিষয়টি ধরা আছে।

> "বাবার বুক দুর্‌দুর্ করতে লাগল, মা দুর্গা নাম জপ করতে লাগলেন। শহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের পূজারি কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবে। মেয়ের রূপের উপর ভরসা; কিন্তু সেই রূপের গুমরতো মেয়ের মধ্যে নেই, যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে দামই দেবে সেই তার দাম। তাই-তো হাজার রূপে গুণেও মেয়েমানুষের সংকোচ কিছুতে ঘোচে না। সমস্ত বাড়ির এমন কি সমস্ত পাড়ার এই আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে পাথরের মতো চেপে বসল। সেদিনকার আকাশের যতো আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুইজোড়া চোখের সামনে শক্ত করে তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগিরি করছিল.....আমার কোথাও লুকোবার জায়গা ছিল না।"[৭৬]

মৃনাল সেই রূপ-গুণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বামীগৃহে পা রেখেছিল। তবু সে সেখানে সুখী হতে পারেনি তার দাম্পত্য সম্পর্ক ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে রূপ নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এর প্রধান কারণ হিসেবে আমরা দেখি, স্বামীর সঙ্গে মৃণালের রুচি ও মানসিকতার ভিন্নতা। মৃণালের ব্যক্তিত্বের তারতম্যের কারণে কেবল তাঁর স্বামীর সঙ্গেই নয়, তাঁর শ্বশুরবাড়ির প্রত্যেক সদস্যের সাথেও তাঁর মানসিক দূরত্ব দেখা দেয় । ফলে দাম্পত্য ও পারিবারিক উভয় দিক থেকেই মৃণাল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই সে আমিত্বের মুক্তির স্বাদ লাভ করেছে। ঘরকন্নার পরও যে নারীর কিছু নিজস্ব জিনিস থাকে তা নিয়ে মৃণাল দাম্পত্য জীবনের নিঃসঙ্গতাকে এক পার্শ্বে সরিয়ে রেখে তাঁর আপনকে নিয়ে একলা চলেছে।

'আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জাননি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যাই হোক-না, সেখানে তোমাদের অন্দর মহলের পাঁচিল ওঠেনি । সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি 'আমি'।[৭৭]

এখানে স্বামী গৃহে মৃনালের নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের একটা পরিচয় আমরা পেয়ে যাই। যেটি আড়াল করবার জন্য বিকল্প কোনো কিছু খুঁজে পাই না। বরং তাঁর কৃতিত্ব, মেধা, মননশীলতাও ছিলো বিশেষভাবে উপেক্ষিত, অবহেলিত। তাঁর লুকিয়ে কবিতা লেখার বিষয়টি এ প্রসেঙ্গে স্মরণযোগ্য।

'আমি যে কবি সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়েনি।[৭৮] এই কবিত্ব শক্তিই মৃনালের অন্তরের সবচেয়ে বড় শক্তিই । এ শিল্পবোধটিই তাকে অন্য সব নারী থেকে পৃথক করেছে এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে সহায়তা করেছে। সে কোনো প্রকার চিন্তা না করেই বলতে পেরেছে –

"আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরবনা। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয় যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।"[৭৯]

বিন্দু নামের মেয়েটির ওপর পুরুষ শাসিত সমাজের নির্মম অত্যাচার, নির্যাতন ও অপমানের গ্লানি মৃনালের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে প্রবলভাবে । সে দেখেছে- পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর মন কত মূল্যহীন,তার চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের সীমাহীন উদাসিনতা, তাদের চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্তের অতি নির্মমতা। এ সত্য সব মেয়ের বেলাতেই নির্মম সত্য বলেই উপলব্ধি করেছে মৃনাল। ফলে আরোপিত এহেন লাঞ্চনাকে মেনে নিতে পারেনি সে। পারেনি বলেই তাকে আমরা আত্মমুক্তির

Dhaka University Institutional Repository

পথানুসন্ধান করতে দেখি। তাঁর কাছে বিন্দু কেবল বিন্দু নয়, 'জীবনের কণা', পুরুষশাসিত সমাজ-সংসারে নারীর স্থান নির্দশক।

> "বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথ গাছের অঙ্কুর বের করে শেষকালে তা থেকে ইঁটকাঠের বুকের পাজঁর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোটো একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল। তারপর থেকে ফাটল শুরু; হলো।"[৮০]

বিন্দুর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে সংসারের সবাই যখন তার ওপরে অন্যায় কার্যকলাপে লিপ্ত ঠিক তখনই এর প্রতিবাদ হিসেবে মৃণাল বিন্দুর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। এর কারণ, বিন্দু যে কেবল অসহায়, কেবল একজন নারী তাই নয়, মৃণালের কাছে বিন্দু 'জীবনের কণা'। যে জীবন নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সমভাবে বর্তমান। মৃণালের এই সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে স্বামীর সঙ্গে দুরত্বও বেড়েছে ক্রমশ। গল্পে দাম্পত্য বিরোধ কিংবা স্বামী সম্পর্কে কোন অভিযোগ সে করেনি। বরং বলেছে "দুঃখ বলতে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা অসচ্ছল নয়, তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন কোন দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি।"[৮১] কিন্তু বিন্দুর প্রতি মৃণালের ভালবাসাকে বন্ধ করতে তথা মৃলালকে প্রতিরোধ করতে যে সমস্ত ব্যবহার করেছে তা স্ত্রীর আত্নসম্মানের প্রতি চরম অবমাননাকর। এমনকি মৃণালের হাত খরচের টাকা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে। মৃণালের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী স্বামীর সে নীচতায় দমে যায়নি মোটেও। বরং দ্বিগুণ সহনশীলতার মধ্যে দিয়ে নিজেকে সংযত করেছে, নিজের সিদ্ধান্তে থেকেছে অটল, পুরুষের হীনমন্যতার প্রতিবাদ জানাতে সোচ্চার হয়েছে। স্বামীর কাছে লেখা পত্রে তার প্রমাণ মেলে। বিন্দুকে আমি যে-সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলে যে, আমার হাত খরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাচঁ সিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুম। আর, মতির মা যখন আমার এঁটো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এলো তাকে বারণ করে দিলুম। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এঁটো ভাত বাছুরকে খাইয়ে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ সেই দৃশ্যটি দেখে তুমি খুব খুশি হও নি। আমাকে খুশি না করলেও চলে আর তোমাদের খুশি না করলেই নয়, এই সুবুদ্ধিটা আজ পর্যন্ত আমার ঘটে এলো না।"[৮২]

পুরুষ শাসিত সমাজে নারী এবং পুরুষের মধ্যে এই যে বৈষম্য, তাকে মৃণাল ঘৃণা করেছে স্পর্ধাভরে। এমন কি বিন্দুর মৃত্যু নিয়ে যখন বাড়ীর পুরুষেরা করেছে উপহাস, বলেছে এ সমস্ত নাটক করা-তার প্রতিও মৃণালের তীব্র ব্যঙ্গের তীর নিক্ষেপিত হয়েছে। "নাটকের তামাশাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের

Dhaka University Institutional Repository

শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন আর বাঙালি বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।"[৮৩]

এ গল্পে মৃণালের অভিযোগ কেবল তার স্বামীর প্রতি নয়, সমাজের সকল পুরুষের প্রতি যারা নিয়ন্ত্রণ করে সমাজ, সংসার। সে কারণে মৃণালের চিঠিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'তোমরা', 'তোমাদের' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। পুরুষসৃষ্ট চার দেয়ালের অন্দরমহলে নারীর অপমানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে মৃণাল। বিদ্রোহী নারী এখানে পুরুষের পাশে সমমর্যাদা দাবী করেছে। আত্মসম্মানের লাঞ্ছনার কারণেই মৃণাল খুজেঁছে আত্মমুক্তি। সে মুক্তি মৃত্যুর মধ্যে নয়, অন্বেষণ করেছে কোলকাতার সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিকে ছাড়িয়ে, মেজো বউয়ের খোলস পরিত্যাগ করে আপন ব্যক্তিত্বে উদ্ভাসনের মধ্যে দিয়ে। সেখানে সে পেয়েছে অনন্ত জীবনার্থ। অস্তিত্ববান হয়ে উঠার অনন্ত প্রেরণা। তাই সে বলতে পারে 'লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা, আমিও বাচঁবো'।

এইভাবে পুরুষের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইঙ্গিতে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আর পুরুষ শাসনের প্রতি মৃণালের তীব্র ব্যক্তিত্ব উৎসারিত সমস্ত ঘৃণা, প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে 'তোমাদের চরণতলাশ্রয় ছিন্ন' শব্দের মধ্যে দিয়ে। পুরুষের পায়ের তলায় আর নারীরা পিষ্ট হবে না, অত্যাচারিত, অবদমিত হবে না, আশ্রিত হবে না। সে আশ্রয়কে ছিন্ন করে নারীরা বেরিয়ে আসবে, জীবনের সুষ্ঠু সুন্দর বিকাশে নিজেকে নিযুক্ত করবে এই প্রত্যয় নিয়ে নারীরা অগ্রগামী হবে, বেঁচে থাকার মন্ত্রে হবে দীক্ষিত, যেমন হয়েছে মৃণাল। এদিক থেকে মৃণাল নামকরণটি তাৎপর্যপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, পুরুষশাসিত সমাজ, সংসার ছেড়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠায় বর্হিজগতে পা বাড়ানোর এই যে প্রত্যয়, যা রবীন্দ্র-সৃষ্ট নারীদের মধ্যে সবচেয়ে সুস্পষ্ট এবং প্রবল, তা প্রথম ধারন করেছে উনবিংশ শতাব্দীতে হেনরিক ইবসন রচিত *'এ ডলস হাউজ'*-এর 'নোরা' চরিত্র।

১৭. পয়লা নম্বর

'পয়লা নম্বর' (১৯১৭) নারীর ব্যক্তিত্বময় ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হয়ে উঠবার গল্প। গল্পের নায়িকা অনিলার মধ্য দিয়ে পুরুষ ও পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভুত নারীর ক্ষোভ, দ্রোহ, মুক্তিকামিতা প্রকাশ পেয়েছে এবং তা কোনো সংকীর্ণ অর্থে নয়,বৃহৎ অর্থে, নারী তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতির দাবীতে নিজেকে স্বনিরূপিত পথে পরিচালিত করেছে। এ গল্পে আমরা অনিলার মধ্যে যে চারিত্রিক দৃঢ়তা লক্ষ করি তা অন্যসব নারী চরিত্র থেকে স্বতন্ত্র্য।

'প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর' (১৯১৪)কালে অবহেলিত, লাঞ্ছিত জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে ভীত, বিপরীতমুখী নানা প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা করে, নিজের মত- পথ নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার দূরন্ত সাহস-

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিই অনিলাকে পূর্বসুরীদের থেকে পৃথক করেছে। নারীর আত্মজাগরণ ও আত্মমুক্তির যে ধারা গতি প্রকৃতি আমরা গল্পগুচ্ছের অন্যান্য গল্পের মধ্যে পেয়েছি, তা থেকে 'পয়লা নম্বর' অনেকটা ভিন্ন। এখানে নারী তাঁর অপমান, লাঞ্ছনা, বঞ্চনার, উপক্ষোর জন্য সরাসরি অভিযুক্ত করেছে পুরুষকে এবং সেই সাথে পুরুষশাসিত সমাজকে এবং তা পুরুষের আত্মভাষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নারী তাঁর মূল্য ও মর্যাদা পেয়েছে। গল্পে সিতাংশুমৌলি বাইরের মানুষ হয়েও 'পরম বিস্ময়ের ধন অনির্বচনীয়' অনিলাকে আবিষ্কার করেছে নবজাগরণের মধ্য দিয়ে। গোপনে সে তার মহিমাকে 'পূজা' করেছে 'শ্রদ্ধা' করেছে। অথচ অদ্বৈতচরণ একান্ত কাছের মানুষটি হয়েও তা করেনি। এতটুকু চেষ্টাও ছিল না তাঁর মধ্যে- অনিলার কর্তব্য-কর্ম, আনন্দ,বেদনার সহকর্মী হয়ে উঠবার পক্ষে কোনো আয়োজন দেখি না আমরা। অনিলাকে সে নিছক স্ত্রী হিসাবেই দেখেছে সমাজের আর সব পুরুষের মত। সংসার এবং অনিলা দু'য়ের প্রতিই সে চরম উদাসীন থেকেছে। ফলে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে কেবল দূরত্বই বেড়েছে। যে কারণে অনিলাকে বেছে নিতে হয়েছে স্বনির্বাচিত নৈঃসঙ্গের পথ। যার ফলে স্ত্রীকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ হতে হয়েছে অদ্বৈতচরণকেও। সে আঘাত পেয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। নিজের অপরাধবোধে হয়েছে জর্জরিত। দীর্ঘ আট বছর দাম্পত্য জীবনে আবিষ্কার করতে পারেনি সে অনিলাকে। অনাবিস্কৃত অচেনা, অদেখাই থেকে গেছে সে । কিন্তু তার প্রতিবেশী সিতাংশুমৌলি অল্প সময়েই তা পেরেছে। রাগে-অনুরাগে, আনন্দ-বেদনায় সে আবিষ্কার করেছে অনিলাকে। যা তার পারার কথা ছিল। এই অনুভব তাকে পীড়ন করেছে। এবং বাস্তব চেতনা সম্পন্ন হয়ে অনুশোচনা করেছে সে।

> 'পুরোহিতের হাত থেকে অনিলাকে আমি পেয়েছিলুম, কিন্তু তার বিধাতার হাত থেকে তাকে গ্রহন করবার মূল্য আমি কিছুই দিইনি।'...'কিন্তু এ কী আশ্চর্য। সিতাংশু যাকে ক্ষণকালের ফাঁক দিয়ে দেখেছে আজ আট বছরের ঘনিষ্টতার পর এই পরের চিঠিগুলোর ভিতর দিয়ে তাকে প্রথম দেখলুম।....যাকে আমি কোন দিনই দেখিনি, এক নিমেষের জন্য পাইনি, তাকে আর কেউ যদি আপনার জীবন উৎসর্গ করে পেয়ে থাকে তবে কী বলে কার কছে আমার ক্ষতির নালিশ করব।''[৮৪]

অদ্বৈতচরণকে প্রচণ্ড ইর্ষা করেও, শেষে "সিতাংশুর লেখা এই চিঠিগুলি আমরই চিঠি হয়ে উঠল-ওগুলি, আজ আমারই প্রাণের স্তবমন্ত্র"[৮৫] বলে অকপটে স্বীকার করে নিয়েছে তাকে। গল্পে সিতাংশু অনিলাকে দেখেছে কামনার বাইরের দৃষ্টি দিয়ে। ফলে তা সৃষ্টির নির্মল আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠেছে। তার চাওয়া তাই প্রাপ্তির অপ্রাপ্তির হিসেব ছাপিয়ে শাশ্বত রূপ লাভ করেছে। প্রগাঢ় প্রশান্তিতে রোমাঞ্চিত হয়েছে সে।

Dhaka University Institutional Repository

> "আমি তোমাকে দেখেছি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্ছি, কিন্তু দেখবার মতো লেখা আমার জীবনে এই বত্রিশ বছর বয়সে এই প্রথম ঘটল। চোখের উপর ঘুমের পর্দা টানা ছিল; তুমি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে-আজ আমি নবজাগরণের মধ্য দিয়ে তোমাকে দেখলুম,যে তুমি স্বয়ং তোমার সৃষ্টিকর্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই অনির্বচনীয় তোমাকে। আমার যা পাবার তা পেয়েছি আর কিছু চাই নে, কেবল তোমার স্তব তোমাকে শুনাতে চাই।"[৮৬]

কিন্তু অনিলা সেই স্তব প্রত্যাখ্যান করেছে। "আমি চললুম, আমাকে খুজঁতে চেষ্টা করোনা। করলেও খোঁজ পাবে না"[৮৭] বলে আত্মমুক্তির পথে পা বাড়িয়েছে। দাম্পত্য সংসারে স্বামীর উপেক্ষা অনাদর নিরবে সহ্য করে সংসার ত্যাগ করেছে,নিখোঁজ হয়েছে। কিন্তু অনিলার প্রত্যাখ্যানপত্র পাবার পরও সিতাংশু অনিলার প্রতি আগ্রহ হারায়নি।'এনামেল করা সোনার কার্ড-কেস' এর মধ্যে অনিলার পত্র সংরক্ষণ করে তাকে সম্মানিত করেছে। তাকে পাবেনা জেনেও হৃদয়ের সমস্ত উষ্ণতা শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, মনোযোগ অনিলার দিকেই অব্যাহত রেখেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র ঃ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, প্রথম প্রকাশ–১৩৩৩, কলিকাতা,পৃষ্ঠা -১৩

২.পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৩।

৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫।

৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫।

৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬।

৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬-১৭।

৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮।

৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৮।

৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৯।

১০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৮।

১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৯।

১২. শ্রী ভূদেব চৌধুরী- *বাংলা সাহিত্যে ও ছোটগল্প ও গল্পকার*, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম প্রকাশ,(নতুন সংস্করণ) কলকাতা ২০০৩, পৃষ্ঠা-১১১।

১৩. আনোয়ার পাশা : *রবীন্দ্র ছোট গল্প সমীক্ষা*, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ভাদ্র, ১৩৭৬ পৃষ্ঠা–২৪ ।

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, প্রথম প্রকাশ–১৩৩৩, কলিকাতা,পৃষ্ঠা -১০০।

১৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৩।

১৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০২।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৭।

১৮.পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৭।

১৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৭।

২০. আনোয়ার পাশা : *রবীন্দ্র ছোট গল্প সমীক্ষা*, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ভাদ্র, ১৩৭৬ পৃষ্ঠা–২৬ ।

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, প্রথম প্রকাশ–১৩৩৩, কলিকাতা,পৃষ্ঠা -১৮২।

২২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৬।

২৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮৬।

২৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮৭।

২৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

২৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৮।

২৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৮।

২৮. আনোয়ার পাশা : *রবীন্দ্র ছোট গল্প সমীক্ষা*, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ভাদ্র, ১৩৭৬ পৃষ্ঠা–৩৭।

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, প্রথম প্রকাশ–১৩৩৩, কলিকাতা,পৃষ্ঠা -২১৮।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩০।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২১৯।

৩২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২০।

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২৭।

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২৬।

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৩৯।

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২১৬।

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৪৭।

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৫৪।

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৫৫।

৪০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৫৫।

৪১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৫৭-২৫৮।

৪২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬০-২৬১।

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৫৮।

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬১।

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬২।

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৩।

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৫।

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৫।

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৭০।

৫০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৭২।

৫১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৯।

৫২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৯১।

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৯২।

৫৫. আনোয়ার পাশা : *রবীন্দ্র ছোট গল্প সমীক্ষা*, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ভাদ্র, ১৩৭৬, পৃষ্ঠা- ৩৭।

৫৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, প্রথম প্রকাশ–১৩৩৩, কলিকাতা,পৃষ্ঠা -৩৯৬।

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯৭।

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯৯।

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯৫।

৬০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯৭-৩৯৮।

৬১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪২৮।

৬২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪২৭।

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪২৭।

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮৯।

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫৬।

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫৩।

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮৯।

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮২-২৮৩।

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮৩।

৭০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮৫।

৭১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮৫।

৭২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮৭।

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮৯।

৭৪. ক্ষেত্রগুপ্ত – *রবীন্দ্র গল্পঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ*, গ্রন্থনিলয়, অগাস্ট, ১৯৯১, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১৮৬।

৭৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, প্রথম প্রকাশ–১৩৩৩, কলিকাতা,পৃষ্ঠা -৬৭০।

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৬৯-৬৭০।

৭৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৭০।

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৭০।

৭৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

৮০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৭১।

৮১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৭৯।

৮২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৭৪।

৮৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৮৯।

৮৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৪০।

৮৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৪০।

৮৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৩৯।

৮৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৪০।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

উপসংহার

কালের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবস্থান উনিশ শতকের শেষার্ধ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধ (১৮৬১-১৯৪১) সময় পরিসরে। যেকারণে এই দুই শতকের সামাজিক ,রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য, এবং এগুলোর প্রভাবে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা, জটিলতা ও টানাপোড়েন তাঁর চিন্তায় ছায়া ফেলেছে স্বাভাবিকভাবেই। ফলে তাঁর লেখায়, সৃষ্ট চরিত্রে ও নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, যুগযন্ত্রণার বিষয়টি স্থান করে নিয়েছে। উনিশশতকীয় কালসীমায় পূর্ববঙ্গীয় গ্রামীণ সমাজের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, একদিকে বিভিন্ন অবরুদ্ধতা, স্থবিরতা; অন্যদিকে বিশ্বাসের অভাবে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বেড়ে চলে দূরত্ব, বিচ্ছিন্নতা । যা পরবর্তীতে সমাজে নানা মুখী ভাঙনের কারণ হয়েছে। এই ভাঙনের মূল কি? এবং এর পরিণামই বা কি? এ জিজ্ঞাসার জবাব সন্ধান করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গল্পের ভিতরে। তাঁর রচিত ছোটগল্পের সংখ্যা প্রায় একশোটি। বিষয়বস্তু, রচনা কৌশল এবং জীবনের বিশিষ্ট স্তর ও যুগ বৈশিষ্ট্যের বিচারে গল্পগুলো ভিন্নধর্মী। তাঁর গল্পজীবন 'হিতবাদী সাধনা পর্ব, সাধনা-ভারতী পর্ব ,ভারতী-সবুজপত্র পর্ব এই প্রধান তিন পর্বে বিভক্ত হতে পারে।

১৮৯১- ১৯০০ সালে রচিত গল্পগুলোকে রবীন্দ্র গল্পের প্রথম পর্ব হিসেবে ধরা হয়। এ সময়ে রচিত গল্পের বেশির ভাগই পদ্মাতীরবর্তী গ্রামীণ জীবন নির্ভর। ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় বাংলার পল্লী সমাজ, জীবন ও প্রকৃতির চিত্র এই পর্বের গল্পকে বিশিষ্ট করেছে। এই সময়ের গল্পে নারী চরিত্রগুলো গ্রাম্য সারল্য নিয়ে উপস্থিত। পাশাপাশি নারীকে পুরুষের শাসন–দুঃশাসন মেনে নিতে দেখা যায় প্রতিবাদহীন ভাবে। দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে –অধিকতর বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে অল্প বয়সের বালিকা বা কিশোরীর বিয়ে হতে দেখা যায়। এবং অসম বিবাহের কারণে সেকালে পুরুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে নারীর জীবনযন্ত্রণা বৃদ্ধির কারণ হয়েছে। সে কারণে নারীর আত্মবেদনা, নিজের জীবনের প্রতি ঘৃণা গল্পে স্থান করে নিয়েছে। এই গল্পগুলোর কাহিনীর অনুষঙ্গ হয়ে গ্রাম্য প্রকৃতি চরিত্রচিত্রণে ও বর্ণনার উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও রূপক হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রয়োজন মাফিক আত্মকথন, কথোপকথন, নাটকীয় সংলাপে গল্পগুলির পরিবেশনা আমাদের আকৃষ্ট করে। সব মিলিয়ে রবীন্দ্র-ছোটগল্পগুলি ছোটপ্রাণ-ছোটব্যথার চিত্রণে মাধুর্যময়।

এ পর্বের প্রতিনিধিস্থানীয় গল্পগুলোর মধ্যে 'সমাপ্তি' 'দৃষ্টিদান','সুভা' 'খাতা','জীবিত ও মৃত', 'মহামায়া', 'পোস্টমাস্টার', 'দেনা-পাওনা ইত্যাদির নাম করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বরাবরই ঔপনিবেশিক শাসনে ক্লিষ্ট ভারতবর্ষের হতদরিদ্র রূপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

উপনিবেশের অধীন কলকাতা নগরে বেড়ে ওঠা নিম্নবর্গের মানুষের সঙ্গে যোগহীন শিক্ষিত বাবু পোস্টমাস্টার এবং একটি অশিক্ষিত অনাথা সরল বালিকা রতনের মধ্যকার সম্পর্কের তুলনামুলক বিচারে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রতনের আন্তরিক সেবার মূল্য দিতে পারেনি পোস্টমাস্টার। অথচ রতন 'মিথ্যা আশাকে দুই বাহু পাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে' জড়িয়ে ধরে 'পোস্টআফিস গৃহের চারদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া' ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে।

'সুভা' গল্প এক মুক বালিকার মনোরাজ্যের সকরুণ আলেখ্য। এতে প্রকৃতির সঙ্গে বোবা নারীর একাত্মতা যত ব্যঞ্জনাময় তার চেয়ে গল্পের শেষ লাইনটি অনেক বেশি করুণাঘন 'এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল'।

'দেনাপাওনা' সামাজিক একটি প্রথার যাতাকলে পিষ্ট নারীর মর্মবেদনার চিত্র। দরিদ্র পিতা পণের টাকা শোধ করতে না পারায় শ্বশুরবাড়ির অকথ্য অত্যাচারে মৃত্যুবরণ করতে হয় নিরুপমাকে। এখানেও সুভা গল্পের শেষ লাইনটির সাদৃশ্য আছে গল্পের শেষাংশে–'এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়'।

'জীবিত ও মৃত' গল্পে নারীর অমর্যাদাকে মূর্ত করে পুরুষের সুবিধাবাদের স্বরূপকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাদম্বিনীকে মৃত ভেবে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হলে সে জেগে উঠেছে এবং পরবর্তীকালে তার জীবন্ত অস্তিত্ব অতিপ্রাকৃতের আবহ সৃষ্টি করেছে। যদিও এই অতিপ্রাকৃত অবস্থা শেষ পর্যন্ত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখায় উত্তীর্ণ। তবু তৎকালীন সমাজের সামনে ' কাদম্বিনীকে 'মরিয়া প্রমাণ' করল যে,সে মরে নাই।'

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের এই সমস্ত রচনায় এক ধরনের গীতিময়তা আছে। ব্যঞ্জনা,আঙ্গিক পরিপাট্য, ভাষা ও ভাবসুষমায় গল্পগুলিকে শিল্পোত্তীর্ণ করেছে।

১৯০১-১৯১৩ সালের মধ্যে রচিত গল্পগুলো দ্বিতীয় পর্বের গল্প ।এ সময়ে রচিত গল্পের বেশিরভাগ পটভূমিই শহর, বিশেষ করে কলকাতা নগরী। এ পর্বের গল্পগুলোর আর একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নারীপুরুষের চরিত্র নিয়ে মনোধর্মী বিশ্লেষণ। নাগরিক নারী-পুরুষের বাস্তব জীবন অপেক্ষা তাদের অর্ন্তজীবনের গভীরতা ,চেতন-অবচেতন মনের কামনা বাসনার রূপায়ণ ঘটেছে বেশি। শহর কেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থায় নারী-পুরুষ উভয়কেই শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহী হতে দেখা যায় এবং কর্মের প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে দেখা যায়।

বিশ শতকের আধুনিকতা,প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অস্থিরতা ব্যক্তির মন ও মননের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে থাকে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য-বিচ্ছেদ দেখা দেয়। এ পর্বের গল্পগুলোতে ব্যক্তির চরিত্র চিত্রণের পরিবর্তে তাঁর আত্মান্বেষণই মুখ্য হয়ে উঠেছে। নিঃসঙ্গতায় পর্যবসিত হয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। এ সময়ে সমাজের অনিবার্য ভাঙনের মুখে পড়ে নারী-পুরুষের

Dhaka University Institutional Repository

পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরেছে। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সন্দেহ ও অবিশ্বাস বেড়েছে। যে কারণে খুব সহজেই দাম্পত্য সংসারের শান্তি বিনষ্ট হয়েছে।

১৯১৪ সাল থেকে ১৯৪০ সাল, কালপরিসরে রচিত গল্পগুলিতে দ্বিতীয় পর্বের গল্পের মত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রধান কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন,ইউরোপীয় ধনবাদী সমাজের বিকাশ রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সমাজ-সংস্কৃতির পুনবিন্যাস। তবে এ সময়ের নারী চরিত্রগুলো আগের মতো অসহায়,নিরুপায় হয়ে থাকেনি, সাহস সঞ্চয় করে আত্মমর্যাদায় বলীয়ান হয়েছে। দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা মেনে নিয়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

ইংরেজদের আগমনে কলকাতানগরী রাতারাতি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে ব্যবসা বাণিজ্যের। ফলে এখানকার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। এদের অনুকরণে গড়ে ওঠে নব্য বাবুসমাজ,

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের নগর কলকাতার উশৃঙ্খল নাগরিক জীবন প্রত্যক্ষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তৎকালীন কলকাতার বিলাসী বাবুসমাজের চিত্রাঙ্কণ করতে গিয়ে লিখেছেন 'মানভঞ্জন' গল্পটি। এ গল্পে গিরিবালার স্বামী গোপীকানাথকে বাবুসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে দেখিয়েছেন। চাকচিক্কময় উশৃঙখল জীবন তথা রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীদের প্রতি আকর্ষণ বা মোহের ফলে গিরিবালা ও গোপীকানাথের দাম্পত্য জীবন হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত। যুগযন্ত্রণায় অস্থির মানুষের মনোবিকার বা মনস্তাত্ত্বিক নানা দিক নিয়ে বিশ্লেষণ আছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। আমরা তাঁর 'প্রায়শিত্ত, নিশীথে, মনিহারা, প্রভৃতি গল্পে এর পূর্ণ সত্যতা খুঁজে পাই।

নারীর ব্যক্তিত্বের চেতনার ব্যতিক্রম হচ্ছে 'প্রায়শ্চিত্তে'র বিন্ধুবাসিনী, 'দৃষ্টিদানের কুমুদিনী। এরা স্বামীর সঙ্গে থাকতে পারার মধ্যেই জীবনের সবটুকু গৌরব মনে করেছে। কিন্তু দেব-দেবী হিসেবে নয়, তাদের স্বামী-স্ত্রীর মিলন সার্থক হয়েছে মানব-মানবীর স্তরে নেমে আসবার পরে। কারণ কালের পালে তখন মানব-মাহাত্ম্যের হাওয়া লেগেছে, রামকে অতিক্রম করতে শুরু করেছে রাবণ। এই মানব-মাহাত্ম্যের জয়গান আছে 'প্রতিবেশিনী' গল্পে। এখানে ধর্মীয় আচারনিষ্ঠা অপেক্ষা অনেক বেশি মূল্য পেয়েছে একটি বিধবার চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি। যুগসচেতন মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই তাঁর শিল্পের প্রধান বস্তু করেছেন মানুষ। ধর্মীয় আচারনিষ্ঠা অপেক্ষা মানুষের জীবন অনেক বেশি মূল্য পেয়েছে তাঁর কাছে। গল্পগুচ্ছের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের প্রাগ্রসর বোধের পরিচয়টি আমাদের অভিভূত করে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেবল দাম্পত্য সংসার, প্রেম কিংবা অপ্রেমেই সীমাবদ্ধ নয়, কর্মের মধ্যে দিয়ে মানুষের প্রতিষ্ঠার পেছনে পরস্পরের ক্রিয়াশীল ভূমিকার গুরুত্বও অনেক।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের সার্থক স্রষ্টা শুধু নন, ছোটগল্পের সার্থক প্রকৃতি নির্ণায়ক, প্রচুর ইঙ্গিতবাহক, ছোটগল্পের আদর্শ ভাষার নির্মাণকারী এবং বিচিত্র স্বাদের অমেয় বৈচিত্র্য সঞ্চারক। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প আশ্চর্য নির্ভার,নিটোল, নাগরিক জীবনবৃত্তান্ত নয়, গ্রামীণ প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিনতার ছবি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃজনী প্রতিভার যাদুকাঠি স্পর্শে বাংলাসাহিত্যকে শুধু যে সমৃদ্ধ করেছিলেন তাই নয়, তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকদের যেমন, ঠিক তেমনি ভাবে পরবর্তীদেরও করেছে প্রভাবিত।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ক. মূলগ্রন্থ

গল্পগুচ্ছ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা ১৪০৫।

খ. অন্যান্য রবীন্দ্র গ্রন্থ

১. *গীতবিতান* : বিশ্বভারতী, কলকাতা -১৪০৬

২. *চোখের বালি* : রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড বিশ্বভারতী কলকাতা।

৩. *চতুরঙ্গ* : রবীন্দ্র রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড বিশ্বভারতী কলকাতা।

৪. *ঘরে বাইরে* : রবীন্দ্র রচনাবলী চতুথ খণ্ড বিশ্বভারতী কলকাতা।

৫. *যোগাযোগ* : রবীন্দ্র রচনাবলী চতুথ খণ্ড বিশ্বভারতী কলকাতা।

৬. *শেষের কবিতা* : রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড বিশ্বভারতী কলকাতা।

৭. *রবীন্দ্র রচনাবলী* : প্রথম খণ্ড, রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী বিশ্বভারতী

৮. তৃতীয় খণ্ড : প্রথম খণ্ড, রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী বিশ্বভারতী

৯. দ্বাদশ খন্ড : প্রথম খণ্ড, রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী বিশ্বভারতী

প্রবন্ধ

১০. *য়ূরোপ প্রবাসীর পত্র* : রবীন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা

১১. *য়ূরোপ যাত্রীর ডায়রি* : রবীন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা

১২. *চিঠিপত্র* : রবীন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা

১৩. *সঞ্চয়িতা* : বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ

সহায়ক গ্রন্থ

১৪. শ্রীভূদেব চৌধুরী : *বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার*, প্রকাশক - মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ১৯৬২

১৫. শিশির কুমার দাশ : *বাংলা ছোটগল্প*- দেজ পাবলিশিং কলকাতা -১৯৬৩

১৬. ক্ষেত্রগুপ্ত : *রবীন্দ্র গল্প* : অন্য রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থনিলয় কলকাতা, শ্রাবন,১৩৯১,আগস্ট-১৯৮৪।

১৭. আনোয়ার পাশা : *রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা (প্রথম খণ্ড)* স্টুডেন্ট ওয়েজ ঢাকা কার্তিক, ১৩৭০, দ্বিতীয় সংস্করণ ভাদ্র ১৩৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. আবু সয়ীদ আইয়ূব : *পথের শেষ কোথায়* দেজ পাবলিশিং কলকাতা, জুলাই -১৯৭৭ পঞ্চম সংস্করন-২০০১ আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ ২০০১, কলকাতা পান্থজনের সংখ্যা ২০০১, কলকাতা

১৯. অরুনকুমার মুখোপাধ্যায় : *কালের পুত্তলিকা*, কলকাতা -১৯৮২, হৃদয়ের একূল ও কূল দুই বঙ্গের গদ্য সাহিত্য, ইউনিভর্সিটি প্রেস লিমিটেড, কলকাতা -১৯৯৯

২০. ডঃ নীহারঞ্জর রায় : *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প* : রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা - নিউ এজ, কলকাতা

২১. ভূদেব চৌধুরী : *রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্প*, একচল্লিশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা - ফাল্গুন ১৪০৪, বাংলাবিভাগ, ঢাকা

২২. মাসুদুজ্জামান : *উপনিবেশবাদ ও রবীন্দ্রনাথের কলকাতা* -১৯৬২,

২৩. শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : *রবীন্দ্র জীবন কথা* - আনন্দ পাবলিশার্স ,কলকাতা -১৪০৭

২৪.সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় :*ছোটগল্পের চার দিগন্ত*, বামা পুস্তকালয়,দ্বিতীয়সংস্করণ, কলকাতা২০০৫

২৫. ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় : *বাংলা ছোটগল্প সমীক্ষা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, শুভমহালয়া, ১৪১০, কলকাতা

২৬.ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা

২৭.ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, কলকাতা

২৮.ড. পশুপতি শাসমল : *স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা

২৯. সোহরাব হোসেন : *ছোটগল্প পরিক্রমা (প্রথম খণ্ড)* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ২০০৫

৩০. হুমায়ুন কবির : *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর* -অনুবাদ হায়াৎ মাহমুদ, একুশে পাবলিকেশন্স লিঃ ঢাকা, ফেব্রুয়ারি -২০০০

৩১. শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : *শরৎচন্দ্র*, কলকাতা ।

৩২. আহমদ কবির : *রবীন্দ্রকাব্য: উপমা ও প্রতীক*, মুক্তধারা, প্রথম ১৯৭৪, তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারী, ২০০২

৩৩. সুকুমার সেন : *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পঞ্চম খণ্ড*, কলকাতা ১৩৬৫

৩৪. আবু জাফর : *সাহিত্যে সমাজ ভাবনা*, বাংলা একাডেমী ঢাকা জ্যৈষ্ঠ ১৪০২

৩৫. সনৎকুমার বাগচী : *রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ লা বৈশাখ ১৪০০

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান : *প্রমথ চৌধুরী* , বাংলা ভাষা ও গদ্যচিন্তা, বাংলা একাডেমী ঢাকা ফাল্গুন ১৪০৪

৩৭. বাঙালীর মানব ধর্ম : *ভবতোষ দত্ত*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স কলকাতা , পৌষ ১৪০৬

সম্পাদিত গ্রন্থ

৩৮.*বঙ্কিমচন্দ্র অর্ধশত জন্মবর্ষে*, বাংলাদেশ উপন্যাস পরিষদ : আবুল কাসেম ফজলুল হক, জাগৃতি প্রকাশনী, মাঘ- ১৪০৭

৩৯. *আবু সয়ীদ আইয়ূব* : মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, দেজ পাবলিশিং ,কলকাতা ২০০৮

৪০. *রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ* : ভূইয়া ইকবাল- বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বৈশাখ -১৩৯২

৪১. *কাজী আব্দুল ওদুদের পত্রাবলী* : আবুল আহসান চৌধুরী , বাংলা একাডেমী ,ঢাকা, ফাল্গুন ১৪০৫

৪২. *সমালোচনা সংগ্রহ* : অধ্যাপক মাহবুবুল আলম ,খান ব্রাদার্স, ঢাকা জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪

৪৩. *নির্বাচিত রবীন্দ্রকাব্য বলাকা থেকে শেষ লেখা* :প্রনব চৌধুরী ,বাংলাদেশ বইঘর,ঢাকা এপ্রিল ২০০২

৪৪. *প্লেটোর রিপাবলিক* : সরদার ফজলুল করিম, মওলা ব্রাদার্স জুলাই ২০০৫

৪৫. *ধর্ম প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস*: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা ,ডিসেম্বর, ১৯৯৩

৪৬.*পরিবার,ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি* :ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ,ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ঢাকা জানুয়ারী ২০০৭।

৪৭. *বিচিত্রিতা* : *ভারত বিচিত্রার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ*, সম্পাদনা-বেলাল চৌধুরী, নান্টু রায়, বদিউদ্দিন নাজির, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ২০০২ ।